বিশেষ উৎপাদন সম্পৃক্ত কৃষি প্রযুক্তি

ইউনিট ৫

ভূমিকা

পৃথিবীতে বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে অষ্টম স্থানে রয়েছে। এদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট শ্রম বলের (Total labor force) ৪৭% কৃষি সেক্টরে কর্মরত এবং এই সেক্টর বর্তমানে দেশের জিডিপিতে ১৬% অবদান রাখছে। এ দেশের শিল্পের কাঁচামালের উৎস হচ্ছে কৃষি। আমাদের রাজস্ব আয়ের একটা উৎস হচ্ছে কৃষি। এছাড়াও কৃষি পন্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। এদেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির খাদ্য, বস্ত্র, অন্ন, কর্মসংস্থান, শিল্প ও বাণ্যিজ্যের প্রসারের জন্য কৃষির কোনো বিকল্প নেই। তাই গতানুগতিক বা তথাকথিত কৃষি ভুলে গিয়ে বিশেষ উৎপাদন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি পন্য উৎপাদন করতে হবে। এতে নিবিড় পরিচর্যা ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে বর্ধিত জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এর ফলে মানুষের দারিদ্রতা ও বেকারত্ব দূর হবে। কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি কঠিন কিছু নয়, তবে এর মাঝে রয়েছে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যতা। বিশেষ উৎপাদন সম্পর্কিত কৃষি প্রযুক্তির কথা বিবেচনা করেই এ ইউনিটে অনুজীব সার, পাটের রিবন রেটিং, রেশম ও মাশরুম চাষ, মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদন এবং গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -৫.১ : অণুজীব সার
পাঠ -৫.২ : রাইজোবিয়াম, এ্যাজোলা ও ট্রাইকোডার্মা সার
পাঠ -৫.৩ : পাটের রিবন রেটিং
পাঠ -৫.৪ : রেশম চাষ
পাঠ -৫.৫ : মাশরুম চাষ
পাঠ -৫.৬ : মৌমাছি চাষ
পাঠ -৫.৭ : গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন
পাঠ -৫.৮ : ব্যবহারিক : ঘরের ভিতরে মাশরুম চাষ

পাঠ-৫.১ অণুজীব সার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অণুজীব সার কি তা জানতে পারবেন;
- অণুজীব সারে প্রকারভেদ জানতে পারবেন;
- অণুজীব সারের গুরুত্ব জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অণুজীব সার, নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী অণুজীব সার, নডিউল, মাইকোরাইজা, এসপারজিলাস।

অণুজীব সার

যে সকল ক্ষুদ্র জীব খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় তাদের অণুজীব বলে। অণুজীব বা জীবাণু ব্যবহার করে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে অণুজীব সার বলে। উদ্ভিদ জগতের অন্তর্ভূক্ত অণুজীবগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শেওলা ও এক্টিনোমাইসিটিস। প্রাণিজগতের অণুজীব হলো নেমাটোড, রটিফার ও প্রটোজোয়া। তবে অণুজীব সার কেবলমাত্র উদ্ভিদ জাতের অন্তর্গত অণুজীব দিয়ে তৈরী করা হয়। গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে যে, জীবাণু সার ব্যবহারে চীনাবাদাম, মসুর, মুগ, ছোলা, সয়াবীন প্রভৃতি ফসলে নাইট্রোজেন গুটি বা নডিউলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। এতে করে ফসলের ফলনও বেড়ে যায় ২০-৪০%। জীবানু সার অত্যন্ত কম ব্যয় সাপেক্ষ। এর ব্যবহার পদ্ধতি সহজ এবং স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর নয়।

অণুজীব সারের প্রকারভেদ ঃ

১। নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী অণুজীব সার

২। ফসফরাস দ্রবীভূতকারী অণুজীব সার ও

৩। কম্পোস্ট তৈরীকারী অণুজীব সার।

১। নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী অণুজীব সার ঃ এরা বায়ুর নাইট্রোজেন আহরণ ও সংবন্ধন করে। অণুজীব প্রধাণত দুই প্রকারে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।

(ক) মুক্তজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধন ঃ এ শ্রেণীর জীবাণুগুলো মাটিতে মুক্তভাবে বসবাস করে বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে দেহের মধ্যে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করে। এ শ্রেণীর জীবাণুদের মধ্যে রয়েছে এ্যাজোটোব্যাকটর, ক্লসটিডিয়াম, বেইজার-ইনকিয়া প্রভৃতি। জৈব পদার্থ এ সব জীবাণুকে শক্তি যোগায়। এ জীবাণুরা শিকড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, শিকড়ের উপরে কাজ করে। এসব জীবাণু মারা যাবার পর মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। ঐ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে ফসল উপকৃত হয়। এ শ্রেণীর প্রতি বছর হেক্টর প্রতি ১০-২৫ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে সরবরাহ করতে পারে। নাইট্রোজেন যোগ করা ব্যতীত এই জীবাণু জমিতে হরমোন তৈরী করে যা অঙ্কুরোদগমে সহায়তা করে। অশিম্বী জাতীয় ফসল, যেমন-ধান, গম, ভুট্টা, আখ, পাট, তুলা প্রভৃতি ফসলে জীবাণু সারের মাধ্যমে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে ফসলের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব। ১০ কেজি বীজে ২০০ গ্রাম করে ব্যবহার করলে অল্প খরচে নাইট্রোজেন সারের অভাব পূরণ হয়।

(খ) মিথোজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধন ঃ সাধারণত গুটি উৎপাদনকারী উদ্ভিদ এবং রাইজোবিয়াম নামক জীবানু মিথোজীবী হিসেবে বাস করে। গাছের শিকড়ে যদি ঠিকভাবে গুটি হয় তবে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক ১০০-৩০০ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে জমা হতে পারে এবং ফলন বাড়ে ৫০-১০০ ভাগ। প্রতিটি স্বতন্ত্র গুটি জাতীয় ফসলেরর জন্য আলাদা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট জীবাণু সার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। এ জীবাণুরা শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলে গুটি তৈরী করে এবং সেখানে বসবাস করে

বাতাস থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী নাইট্রোজেনে পরিণত করে। শিম জাতীয় উল্লেখযোগ্য ফসল হলো : সয়াবিন, চিনাবাদাম, মুগ, মসুর, ছোলা, বরবটি, মাসকালাই, শনপাট, ধৈঞ্চা প্রভৃতি।

রাইজোবিয়াম জীবাণু সার প্রয়োগ করলে ডালজাতীয় ফসলের শিকড়ে "নডিউল" বা গুটির সংখ্যা তাদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। গুটি তিন রংঙের হয়- গোলাপী-লাল, বাদামী এবং সবুজ এর মধ্যে গোলাপী-লাল রঙের গুটিই সবচেয়ে বেশি নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে পারে।

২। ফসফরাস ঘটিত অণুজীব সার ঃ মাটিস্থ ফসফরাসকে দ্রবীভূত করে গছের জন্য সহজলভ্য করে এরূপ অণুজীব সারকে ফসফরাস অণুজীব সার বলে। মৃত্তিকায় ফসফরাস থাকে সাধারণত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের হাইড্রোক্সাইড, কার্বনেট বা সিলিকেটের সংগে যুক্ত হয়ে অদ্রবণীয় অবস্থায় এবং সহজে দ্রবণীয় ফসফরাস ঘটিত রাসায়নিক সার মৃত্তিকায় প্রয়োগ করায় অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তা আবারও গাছের অগ্রহণযোগ্য ও অদ্রবণীয় যৌগে পরিণত হয়। ফলে মৃত্তিকায় মোট ফসফরাসের পরিমাণ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহন করতে পারে না। ফসফরাস ঘটিত অণুজীব সার মৃত্তিকার এই অদ্রবণীয় ফসফেটকে গাছের গ্রহণযোগ্য দ্রবনে রূপান্তরিত করে এ অণুজীবগুলো বেশ কিছু এনজাইম ও জৈব এসিড উৎপন্ন করে যা অদ্রবনীয় ফসফেটকে দ্রবণীয় ফসফেটে রূপান্তরিত করে। উদাহরণ : *Aspergillus niger, Bacillus megaterium.*

৩। কম্পোস্ট তৈরীকারী অনুজীব সার : কম্পোস্ট তৈরী করতে যে অণুজীব সার ব্যবহার করা হয় তাকে কম্পোস্ট তৈরীকারী অণুজীব সার বলে। যেমন: বিভিন্ন ছত্রাক (ট্রাইকোডার্মা, মাইকোরাইজা, এসপারজিলাস), ব্যাকটেরিয়া (ক্লসট্রিডিয়াম, ব্যাসিলাস) ও অ্যাক্টিনোমাইসেটিস জৈব পদার্থসমূহকে দ্রুতগতিতে পঁচাতে সাহায্য করে।

অণুজীব সারের গুরুত্ব :

১। ফসলের পুষ্টির চাহিদা পূরণে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অণুজীব সার গুরুত্বপূর্ণ ।
২। নাইট্রোজেন অণুজীব সার মাটিতে ও ফসলে বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।
৩। মাইকোরাইজা অণুজীব সার মূলের পৃষ্ঠ এলাকা বৃদ্ধি করে। ফলে এর সাহায্যে উদ্ভিদ বেশি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে।
৪। জীবাণু সার পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না।
৫। এই সারের উৎপাদন খরচ খুব কম এবং মানুষ ও পশুপাখির কোন ক্ষতি করে না।
৬। জীবাণু সার অত্যন্ত কম ব্যয় সাপেক্ষ।
৭। জীবাণু সারের ব্যবহার পদ্ধতি সহজ এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়।
৮। ধানক্ষেতে এই সার জৈব পদার্থ সংযোগ করে।
৯। জীবাণু সার যেমন এ্যজোলা আগাছা দমন করে।
১০। জীবাণু সার যেমন ট্রাইকোডার্মা মাটির ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে এবং জৈব বালাইনাশক হিসাবে মাটি শোধনের কাজ করে।
১১। ফসলে ২৫-১৫০ ভাগ আমিষ বাড়ায়
১২। পরিমাণে খুব কম লাগে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন অনুজীবের সারের তালিকা তৈরি করবেন।

সারাংশ

অনুজীব থেকে উৎপন্ন সারসমূহকে অনুজীব সার বলা যায়। মাটিতে বিভিন্ন রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে মাটির পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ফলে ফসল ফলানো কঠিন হয়ে পড়ছে। কিন্তু অনুজীব সার হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিকারক। জীবানু সার শুধুমাত্র উদ্ভিদ জগতে অন্তর্গত অনুজীবগুলোকে নিয়ে তৈরি করা হয়। অনুজীব সার সহজলভ্যতা ও পরিবেশগতভাবে নিরাপদ হওয়ায় কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি অণুজীব সার নয় ?

ক) কম্পোষ্ট খ) রাইজোবিয়াম

গ) এ্যাজোলা ঘ) ট্রাইকোডার্মা

২। ধানক্ষেতে কোন অণুজীব সার ব্যবহার করা হয়?

ক) ট্রাইকোডার্মা খ) রাইজোবিয়াম

গ) শেওলা ঘ) এ্যাজোলা

পাঠ-৫.২ রাইজোবিয়াম, এ্যাজোলা ও ট্রাইকোডার্মা সার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাইজোবিয়াম সার কাকে বলে তা জানতে পারবেন;
- রাইজোবিয়াম সার তৈরি পদ্ধতি জানতে পারবেন;
- এ্যাজোলা সার কি তা আলোচনা পারবেন;
- এ্যাজোলার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা পারবেন;
- এ্যাজোলা সারের উপকারিতা জানতে পারবেন;
- এ্যাজোলা সারের সীমাবদ্ধতা জানতে পারবেন;
- ট্রাইকোডার্মা সার কি ? তা ব্যাখ্যা পারবেন;
- ট্রাইকোডার্মা সার তৈরীর পদ্ধতি জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ রাইজোবিয়াম, পীট মাটি, জীবাণুমুক্ত করণ, এ্যাজোলা, এ্যানাবিনা, নীলাভ, সবুজ শৈবাল, ট্রাইকোডার্মা, বিয়োজন।

রাইজোবিয়াম কি ?

রাইজোবিয়াম এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া শিম ও ডাল জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের কাছে অবস্থান নিয়ে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্রহন করে শিকড়ে গুটি তৈরি করে। এ ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংযোজন করে নিজের প্রয়োজন মিটায় এবং উদ্ভিদে সরবরাহ করে। শিম জাতীয় উদ্ভিদ যেমন- মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, সয়াবিন, চিনাবাদাম, ধইঞ্চা ইত্যাদি ফসলে ব্যাকটেরিয়া সার ব্যবহার করে উত্তম ফসল পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী রাইজেবিয়াম অণুজীব সার ইউরিয়া সারের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়।

রাইজোবিয়াম অণুজীব সার তৈরীর পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১। রাইজোবিয়াম প্রজাতি নির্বাচন ঃ রাইজোরিয়াম প্রজাতি শিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে নডিউল থেকে সরাসরি আলাদা করে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করা হয়। সংগৃহীত রাইজোবিয়াম প্রজাতি কতোগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ করা হয়। এ কাজের জন্য প্রথমে বিভিন্ন মৃত্তিকায় সুপারিশকৃত উদ্ভিদকে কার্যকরী নডিউল তৈরী করতে সক্ষম হতে হবে। এছাড়া উক্ত উদ্ভিদটির অনুপস্থিতিতে প্রজাতির মাটিতে টিকে থেকে বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

২। আবাদ মাধ্যম ঃ রাইজোবিয়ামের বংশবৃদ্ধির জন্য সাধারণত দুই ধরনের আবাদ মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। কঠিন মাধ্যম ও তরল মাধ্যম।

কঠিন মাধ্যম ঃ কঠিন আবাদ মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে- পিটমাটি, কাঠের গুড়া ও ছাই। জীবাণু যাতে জীবাণুসারে দীর্ঘদিন টিকে থাকে, কার্যকর থাকে এবং ব্যবহারের সুবিধা বিবেচনায় আবাদ মাধ্যমের যাথেষ্ট পানি ধারণক্ষমতা ও প্রচুর কার্বন থাকতে হবে।

তরল মাধ্যম : প্রথমে তরল আবাদ মাধ্যম (Liquid Cul:ure medium) প্রস্তুত করতে হবে। প্রয়োগোপযোগী অণুজীবের চাষ করতে হবে। এরপর তরল মাধ্যমটি ১৫ পাউন্ড চাপে (১২১° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) ৩০ মিনিট ধরে নির্বীজ করা হয় এবং ঠান্ডা করে তরল মাধ্যমে নির্বাচিত অনুজীব (রাইজোবিয়াম) জন্মানো হয়। তরল কালচারকে ২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে অনবরত কিছুক্ষণ ঝাঁকুনি দিলে ভিতরের তরল মাধ্যমে অক্সিজেন প্রবেশ করে প্রচুর অণুজীব উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। অত:পর এ অণুজীব তরল অবস্থায় বাহকের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়। যথেষ্ট সংখ্যক অণুজীব ($>১০^{৬}$ - $১০^{৯}$/মিলিলিটার) জন্মানোর পর পরিমাণমত তরল কালচার নির্বীজ করা পিট মাটির সাথে মেশানো হয়।

৩। পীট মাটি তৈরী : পিট মাটি সংগ্রহের পর রোদে শুকানো হয়। কোন আবর্জনা বা পাথর থাকলে তা ভালভাবে পরিস্কার করে প্রথমে হাতুড়ি দিয়ে ও পরে মেশিনের সাহায্যে গুড়া করা হয়। রাইজোবিয়াম জন্মানোর জন্য ৭৫ মাইক্রোমিটার বিশিষ্ট চালুনি দিয়ে পিটের গুঁড়া চালা হয় এবং এতে শতকরা ২-৩ ভাগ ক্যালশিয়াম কার্বনেট মেশাতে হয় যাতে অম্লমান ৬.৫-৭.৩ হয়। পলিথিনের ব্যাগে ভরে (সাধারণত ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম) তা অটোক্লেভে দিয়ে নির্দিষ্ট সময় ও তাপে নির্বীজ করা হয়। এরপর গামা রেডিয়েশন দিয়ে পিট মাটি জীবাণুমুক্ত করা হয়। এভাবে তৈরি পিট মাটির প্যাকেটে পরিমাণ মতো তরল মাধ্যমে জন্মানো অণুজীব সতর্কতার সাথে সিরিঞ্জের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয় যাতে নতুনভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত অণুজীব ব্যাগে ঢুকতে না পারে। তরল অণুজীব কালচার ও পিট মাটি ভালভাবে মিশিয়ে কয়েকদিন রাখা হয় যা পরবর্তীতে বীজের সাথে মিশিয়ে ব্যবহারের জন্য বাজারজাত করা হয়।

অণুজীব সার জমিতে ব্যবহার পদ্ধতি :

নিচে অণুজীব সারের প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো

১। অণুজীব সার বীজের সাথে মেশানোর সময় আঠালো বস্তু হিসাবে চিটাগুড়, ভাতের ঠান্ডা মাড় অথবা পানি ব্যবহার করতে হয়, তবে পানি ব্যবহার না করাই ভালো।

২। ব্যবহৃত বীজে যদি কোনরূপ কীটনাশক ব্যাবহার করা হয়ে থাকে তবে সেই বীজ পানিতে ভালভাবে ধুয়ে অণুজীব সার মেশাতে হবে।

৩। উত্তম ও সুস্থ সবল বীজ পরিমাণমতো একটি পলিথিন ব্যাগ বা পাত্রে নিয়ে তাতে চিটাগুড় বা ভাতের মাড় মিশিয়ে এমনভাবে নাড়তে হবে যাতে প্রতিটি বীজের গায়ে প্রলেপ পড়ে।

৪। এ প্রলেপযুক্ত বীজের সাথে অণুজীব সার এমনভাবে মেশাতে হবে যাতে প্রতিটি বীজে কালো বর্ণের প্রলেপ পড়ে।

৫। অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ সকাল ৯ টার মধ্যে বা বিকাল ৪ টার পর বপন করে যত দ্রুত সম্ভব মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৬। কোন নির্দিষ্ট ফসলের বীজ আধা ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে সেই পানি ফেলে দিতে হবে। অত:পর রাইজোবিয়াম অণুজীব ঐ বীজের উপর ঢেলে দিয়ে তা ভালোভাবে ছিটিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৭। বীজের গায়ে যাতে সূর্যের আলো না লাগে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। সূর্যের আলো লাগলে অণুজীব মারা যাবে এবং অণুজীব সার প্রয়োগ ব্যর্থ হবে।

এ্যাজোলা

এ্যাজোলা হচ্ছে ভাসমান জলজ পানা। যা পুকুর, ডোবা, নালা, ধানের জমিতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এ্যাজোলার দৈহিক ওজন প্রতি ৫ দিনে দ্বিগুন হতে পারে। এ্যাজেলা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০০-৫০০ কেজি নাইট্রোজেন যোগ করা যেতে পারে। বোরো ধানের জমিতে অতি সহজ ও সফলভাবে এ্যাজোলা চাষ করা যায়। এ্যাজোলা মাটির উর্বরতা ও গুনাগুনের উন্নয়ন ঘটায়। এ্যাজোলা ব্যবহার করলে সালফার ও জিংকের ঘাটতিও দূর হয়। এ্যাজোলার পাতার গহ্বরে অ্যানাবিনা এ্যাজোলি *(Anabaena asollae)* নামক নীলাভ সবুজ শেওলার একটি প্রজাতি মিথোজীবীরূপে বাস করে যা বায়ুমন্ডল থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন সংযোজন করে এ্যাজোলার পাতার গহ্বরে জমা করে। এ এ্যাজোলা মাটিতে চাষ দিয়ে মেশালে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ হয়।

চাষ পদ্ধতি

অতি ঠাণ্ডা কিংবা অতি গরম আবহাওয়ায় অ্যজোলা জন্মাতে পারে না। বাংলাদেশে বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এর চাষ করার উপযুক্ত সময়। যে জমিতে ধান চাষ করা হবে এমন জমি এ্যাজোলা চাষের জন্য নির্বাচন করা প্রয়োজন।

অ্যাজোলার চাষ পদ্ধতি নিম্নরূপ-

১। প্রথমে ৫ বা ৬ সেন্টিমিটার পানি দাঁড়ানো একখন্ড জমি নির্বাচন করে ভালভাবে চাষ বা মই দিয়ে সমান ৮টি প্লটে ভাগ করে নিতে হয়।

২। উক্ত জমির দুইকোণার দুইটি প্লটে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ৫০০-৮০০ গ্রাম হিসেবে তাজা এ্যাজোলা ছেড়ে দিতে হয়।

৩। অ্যাজোলা ছাড়ার আগে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ২.০ গ্রাম কার্বোফোরান-৫ জি প্রয়োগ করতে হয়।

৪। এ্যাজোলা ছাড়ার পর জমির পানি পরিষ্কার হলে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ০.৮-১.৬ গ্রাম টিএসপি সার পানিতে গুলে এ্যাজোলার উপর সরাসরি প্রয়োগ করতে হয়।
৫। এ্যাজোলা যথেষ্ট ঘন হলে পাশের প্লটে এ্যাজোলা ছেড়ে অনুমোদিত পরিমাণ ও পদ্ধতিতে কার্বোফোরান ও টিএসপি প্রয়োগ করতে হয়।
৬। এভাবে এক মাসের মধ্যে সমস্ত জমিটি এ্যাজোলায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

উপকারিতা

এ্যাজোলা ব্যবহারের উপকারিতাসমূহ নিম্নরূপ। যথা-

১। এ্যাজোলা সার মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে নাইট্রোজেন যোগ করে। বিশেষ করে ধান ক্ষেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন সঞ্চয়ন করে।
২। এ্যাজোলা ধানের সাথে একত্রেই জন্মানো যায়; কিন্তু তা ধানের বৃদ্ধিতে কোন ব্যাঘাত ঘটায় না।
৩। এ্যাজোলা অধিক পানিতে জন্মাতে পারে।
৪। এ্যাজোলা আগাছা দমন করে।
৫। উঁচু জমির ফসলে এ্যাজোলা কম্পোষ্টের উপাদান যোগান দেয়। যে সব ফসল জলবদ্ধ অবস্থায় জন্মাতে পারে না। সে সব জমিতে এ্যাজোলা কম্পোষ্ট হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
৬। প্লাবিত এলাকায়, যেখানে সবুজ সার শস্য জন্মানো যায় না, সেখানে এ্যাজোলা জন্মানো যায়।
৭। এ্যাজোলা মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
৮। এ্যাজোলা ব্যবহার করলে প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০-৪০ কেজি নাইট্রোজেন কম লাগে।
৯। এ্যাজোলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

এ্যাজোলা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা : এ্যাজোলা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নরূপ-

১। জমিতে অবশ্যই পানি আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে হবে।
২। উচ্চ তাপমাত্রায় এ্যাজোলার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৩। এ্যাজোলাতে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ অধিক।
৪। বছরের সব মৌসুমে এ্যাজোলা জন্মানো খুব কঠিন।
৫। শামুক এ্যাজোলা খেয়ে ফেলতে পারে।
৬। ফসফরাস প্রয়োগ ব্যতীত এ্যাজোলা উৎপাদন কঠিন।
৭। কম্পোষ্ট সার হিসাবে এ্যাজোলাকে কোন ক্ষেতে প্রয়োগ করতে গেলে পরিবহন করা ঝামেলাপূর্ণ হয়।

ট্রাইকোডার্মা

ট্রাইকোডার্মা এক প্রকার ছত্রাক। এ ছত্রাক বিভিন্ন ময়লা আবর্জনার সাথে ব্যবহার করে যে সার তৈরি করা হয় তাকে ট্রাইকোডার্মা অণুজীব সার বলে। ২৫-৩০° সে তাপমাত্রায় এ ছত্রাক বংশবিস্তার করতে পারে। পচনশীল দ্রব্য বিয়োজনের মাধ্যমে এর জীবন চক্র সম্পন্ন হয়। ট্রাইকো কম্পোষ্ট তৈরিতে ট্রাইকোর্ডামা ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে।

এই ছত্রাকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এটি অন্যান্য অণুজীবের বা ছত্রাকের চেয়ে কঠিন বস্তু যেমন কাঠের গুড়া গাছের শক্ত অংশ বিয়োজন করতে পারদর্শী। মাটিতে এর কোন নেতিবাচক প্রভাব নেই। তাই এটি পরিবেশ বান্ধব। এ ছত্রাক গাছে রোগ সৃষ্টিকারী অনেক রোগজীবাণু খেয়ে ফেলে এবং গাছের সুরক্ষা দেয়। এজন্য একে ডক্টরস্ ফাংগাস বলা হয়।

ট্রাইকোর্ডামা সার তৈরীর পদ্ধতি :

১। প্রথমে মাটিতে ১ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১ মিটার প্রস্থ করে কয়েকটি গর্ত তৈরী করতে হবে গর্তের গভীরতা হবে ১ হাত বা ০.৫ মিটার।
২। অত:পর বাড়ির ময়লা আবর্জনা, পৌরসভার বর্জ্য ইত্যাদি হতে অপচনশীল দ্রব্য। যেমন- পলিথিন, ইট, পাথর ও লোহার টুকরা ইত্যাদি আলাদা করতে হবে।

৩। বৃষ্টির পানি রোধে গর্তের চারধারে আইল দিতে হয়। রোদের তীব্রতা ও ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে গর্তের উপর ঢাকনা দিতে হয়। আবর্জনা গর্তে ফেলার আগে একটু গোবর মেশালে ভাল হয়। শুকনো হলে সামান্য পানি ছিটাতে হয়।
৪। অত:পর প্রতিটি গর্তের জন্য ১৫০ মি.লি. ট্রাইকো সাসপেনশন তৈরি করতে হবে। গর্তে বর্জ্য তিন ধাপে ঢালতে হবে এবং প্রতিটি ধাপে/স্তরেই ট্রাইকোডার্মা সাসপেনশন স্প্রে করতে হবে।
৫। গর্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেলে সমস্ত গর্তের বর্জ্য ভালভাবে মেশাতে হবে।
৬। বৃষ্টি বা প্রচণ্ড রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
৭। সমভাবে পচনের জন্য ৭ দিন অন্তর অন্তর আবর্জনা উল্টে-পাল্টে দিতে হবে।
৮। ৫-৬ সপ্তাহ পর আবর্জনা চা পাতার মত ঝরঝরে ও গন্ধহীন হয়ে ব্যবহার উপযোগী হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন অনুজীবের সারের তালিকা তৈরি করবেন।

সারাংশ

রাইজোবিয়াম বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংযোজন করে। শিম জাতীয় উদ্ভিদে রাইজোবিয়াম সার ব্যবহার করে ফসলের ফলন বাড়ানো সম্ভব হবে। এ্যাজোলা সার মাটিতে মেশালে নাইট্রোজেন যোগ হয়। এ্যাজোলার পাতার গহ্বরে Anabaena নামক নীলাভ সবুজ শেওলা মিথোজীবীরূপে বাস করে যা বায়ুমন্ডল থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন সংযোজন করে এ্যাজোলার পাতার গহ্বরে জমা করে। ট্রাইকোডার্মা নামক ছত্রাক ময়লা আবর্জনার সাথে ব্যবহার করে ট্রাইকোর্ডার্মা সার তৈরি করে। এটি পরিবেশ বান্ধব এবং অন্য ক্ষতিকর ছত্রাক এবং রোগ জীবাণু ধ্বংস করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এ্যজোলা কোন ফসলের জন্য বেশী উপযোগী ?
ক) ধান খ) ডাল জাতীয় ফসল
গ) শিম জাতীয় ফসল ঘ) সকল ফসল

২। এ্যাজোলা কোন সারের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয় ?
ক) টি.এস.পি খ) এম.পি
গ) ইউরিয়া ঘ) গন্ধক

৩। কোনটিকে একই সাথে অণুজীব সার ও জৈব বালাইনাশক হিসাবে ব্যবহার করা যায় ?
ক) এ্যাজোলা খ) রাইজোবিয়াম
গ) ট্রাইকোডার্মা ঘ) ক্লোসট্রিডিয়াম

৪। রাইজোবিয়াম সার মাটিতে সরবারহ করে-
ক) ফসফরাস খ) পটাশিয়াম
গ) সালফার ঘ) নাইট্রোজেন

৫। পীট মাটি কোন অণুজীব সারের বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হয় ?
ক) রাইজোবিয়াম খ) এ্যাজোলা
গ) ছত্রাক ঘ) শেওলা

পাঠ-৫.৩ পাটের রিবন রেটিং

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রিবন রেটিং কী তা বলতে পারবেন;
- পাটের ছাল ছড়ানোর ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাটের ছাল পচানোর পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কম সময়ে পাটের ছাল পচানোর উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- রিবন রেটিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রিবন রেটিংয়ে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পাটের ছাল ছাড়ানো, ছাল পচানো, রিবন রেটিং, রিবনার, রিবনিং, রোলার, আঁশ।

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। পাট ও পাটজাত পন্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা হয়। বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ দেশে উৎপাদিত পাট আঁশের মান খুবই ভালো। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এদেশে পাটের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই পাট চাষ করা হয়। তবে জামালপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, রংপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, ঢাকা প্রভৃতি জেলাতে পাটের চাষ বেশি হয়। যে সব অঞ্চলে পাট কাটার পর পচানোর জন্য পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না ঐসব অঞ্চলে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচানো হয়। এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। এই পদ্ধতিতে পাটের ছাল বা বাকল কাঁচা পাট গাছ থেকে আলাদা করার পর অল্প পানিতে পচানো হয়। অর্থাৎ কাঁচা পাট গাছ থেকে ছাল বা বাকল আলাদা করার পর ঐ ছাল বা বাকলকে যে পদ্ধতিতে অল্প পানিতে পচানো হয়, তাকে রিবন রেটিং (ribbon retting) বলা হয়। এখানে ribbon শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ফিতা এবং retting অর্থ হলো পচানো। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতির মাধ্যমে পাটের ছাল ছাড়ানো যেমন সহজ তেমনি খরচও কম। এছাড়া এটা অত্যন্ত পরিবেশ সম্মত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পাটের ছাল পচালে আঁশের মানও ভাল হয়। পাটের আঁশের গুণাগুণ নির্ভর করে পাট পচানোর পদ্ধতির ওপর, আবার পাটের মূল্য নির্ভর করে আঁশের গুণাগুণের ওপর। কাজেই পাট পচানোর পদ্ধতি, আঁশের গুণাগুণ ও পাটের মূল্য একটির সাথে অন্যটি সম্পর্কিত।

পাটের রিবন রেটিং পদ্ধতির ধাপসমূহ

ক) ছাল বা বাকল ছাড়ানোর পদ্ধতি

১। ৬ ফুট লম্বা এক খন্ড বোরাক বাঁশ নিয়ে এর উপরের দিকের প্রান্ত আঁড়াআঁড়িভাবে এমন করে কাটতে হবে যেন বাঁশটি চালা ঘরের জন্য ব্যবহৃত খুঁটির মত হয়। আড়াআড়িভাবে কাটা বাঁশের প্রান্তটির দু'দিক ফলকের মত দেখাবে যাকে বাঁশের হুক বলে। এরূপ বেশ কয়েকটি বাঁশ নিয়ে প্রত্যেকটির উপরের দিকের প্রান্তে হুক তৈরি করতে হবে। হুকের আকৃতি ইংরেজি V বা U অক্ষরের মত হবে।

২। বাঁশের খন্ডগুলোর গোড়ার অংশ মাটির মধ্যে শক্ত করে এমনভাবে পুততে হবে যাতে একটি বাঁশ থেকে পরবর্তী বাঁশের দূরত্ব ৩ – ৩.৫ ফুট হয়।

৩। এরপর মাটিতে পুতা ঐ বাঁশগুলোর হুকের সাথে অপর একটি মুরুলী বাঁশ বেঁধে আড়া তৈরি করতে হবে যাতে জমি থেকে পাট গাছ কেটে পাতা ঝরানোর পর ঐ আড়ার সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়।

৪। আড়ার সাথে দাঁড় করানোর পূর্বে পাট গাছগুলোর গোড়ার ৩-৪ ইঞ্চি একটি শক্ত কাঠের হাতুড়ির সাহায্যে থেতলে দিতে হবে।

৫। প্রতিটি পাট গাছের গোড়ার দিকের থেতলানো ছাল হাত দিয়ে দুই ভাগ করে গোড়ার পাট কাঠি বাঁশের হুকের মধ্যে রাখতে হবে। এরপর গোড়ার ছালের দুই ভাগ দুই হাত দিয়ে ধরে জোরে টান দিলে ছালগুলো সহজেই আলাদা হয়ে যাবে এবং পাট কাঠি সামনের দিকে চলে যাবে।

৬। এই পদ্ধতিতে ৩-৪ টি পাট গাছের ছাল একসাথে ছাড়ানো যায়। পরে ছাড়ানো ছালগুলো পরিমাণ মতো একসঙ্গে করে গোলাকার মোড়া বাঁধতে হয়।

যার মাধ্যমে পাট গাছের কাঁচা ছাল ছাড়ানো যায় তাকে রিবনার (Ribboner) বলে এবং রিবনারের মাধ্যমে ছাল ছাড়ানোর কৌশলকে রিবনিং (Ribboning) বলে। খন্ডিত বাঁশের দুই মাথায় ইংরেজি U আকৃতির রিবনার শক্তভাবে বেঁধেও পাটের ছাল ছাড়ানো যায়। এছাড়াও লোহার তৈরি দীর্ঘস্থায়ী সিঙ্গল ও ডাবল রোলার উদ্ভাবন করা হয়েছে যার মাধ্যমে কম পরিশ্রমে সহজে ও দ্রুত রিবনিং করা সম্ভব।

চিত্র ৫.৩.১ : রিবনারের মাধ্যমে পাটের কাঁচা ছাল ছাড়ানোর কৌশল (তথ্যসূত্র ইন্টারনেট)

খ) ছাল পচানোর পদ্ধতি

তিন পদ্ধতিতে পাট গাছের কাঁচা ছাল পচানো যায়, যথা –

১। গোলাকার মোড়া বাঁধা প্রায় ৩০ কেজি কাঁচা ছাল ড্রাম বা মাটির চাড়িতে সাজিয়ে নিয়ে ঐ ড্রাম বা চাড়ি পরিষ্কার পানি দিয়ে ভরে দিতে হবে। এতে কাঁচা ছালের পচন ক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

২। গোলাকার মোড়া বাঁধা কাঁচা ছালগুলোকে একটা লম্বা বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে বাড়ির আশেপাশের ছোট ডোবা, পুকুর বা খালের পানিতে ডুবিয়ে রেখেও পচানো যায়।

৩। ছোট ডোবা, পুকুর বা খাল না থাকলে সেক্ষেত্রে বাড়ির আশেপাশে অথবা পাট ক্ষেতের পাশে ১৫-১৬ ফুট লম্বা, ৬-৭ ফুট প্রস্থ ও ১.৫-২ ফুট গভীর গর্ত করে গর্তের তলা ও কিনারা পলিথিন দিয়ে ঢাকতে হবে। এরপর গোলাকার মোড়া বাঁধা কাঁচা ছালগুলোকে গর্তের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে গর্তটি ভর্তি করে ছালগুলোকে পচানো যায়। পচানোর সবগুলো পদ্ধতির ক্ষেত্রেই কাঁচা ছালগুলো কচুরিপানা, খড় বা চট দ্বারা ঢেকে দিতে হয়। সাধারণত ১২-১৫ দিনের মধ্যেই কাঁচা ছালগুলোর পচন কাজ শেষ হয়।

চিত্র ৫.৩.২ (ক) পুকুরে পাটের ছাল পচানোর পদ্ধতি

চিত্র ৫.৩.২ (খ) গর্তে পাটের ছাল পঁচানো পদ্ধতি

গ) কম সময়ে ছাল পচানোর পদ্ধতি

দুই উপায়ে কাঁচা ছাল পচানোর সময় কমানো যায়, যথা –

১। এক হাজার (১০০০) কেজি কাঁচা ছালের জন্য ২৫০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে পচন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়।

২। একটি ছোট হাঁড়ির মধ্যে পানি নিয়ে ২-৩ টা পাট গাছ পূর্বেই কেটে ছোট ছোট টুকরো করে ঐ হাঁড়ির পানিতে পচিয়ে নিতে হবে। পরে এই হাঁড়ির পাট পচানো পানি কাঁচা ছাল পচানোর সময় ব্যবহার করলেও পচনক্রিয়া দ্রুত হয়।

ঘ) ছাল পচনের সমাপ্তি নির্ণয়

পচানোর মাত্রার ওপর আঁশের গুণাগুণ নির্ভরশীল। পচন কম হলে আঁশের সাথে শক্ত শক্ত দাগ থেকে যায়, ফলে আঁশের গুণগত মান হ্রাস পায়। পচনের মাত্রা এমন হওয়া উচিত যাতে আঁশগুলো একটির সাথে অন্যটি লেগে না থাকে। পানিতে ডুবানোর ৮-৯ দিন পর থেকে ছালের পচন সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মোড়া বাঁধা ছালের মধ্য অংশ থেকে কোন একটি ছালের গোড়ার দিকের ২.৫ সে.মি. কেটে তা একটি বোতলের পানির ভিতর ঝাকানোর পর পানি ফেলে দিয়ে পুনরায় বোতলে পরিষ্কার পানি নিয়ে ঝাকালে যদি দেখা যায় যে, আঁশগুলো বেশ পৃথক হয়ে গেছে তাহলে বুঝতে হবে ছালের পচন কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এছাড়াও দু'একটি ছাল বের করে নিয়ে পানিতে ধুলে যদি আঁশগুলো বেশ আলাদা আলাদা মনে হয় তাহলে পচন কাজ সম্পন্ন হয়েছে ধরে নিতে হবে।

ঙ) পাটের ছাল বা আঁশ ধৌতকরণ

পরিষ্কার পানিতে আঁশগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে আটি বাঁধতে হয়।

চ) পাটের আঁশ শুকানো

রৌদ্রময় স্থানে বাঁশের আড় তৈরি করে আঁশগুলো শুকাতে হয়। শুকানোর পর তা একত্রে বেঁধে রাখা হয়। অতিরিক্ত শুকানো বা কম শুকানো উভয়েই আঁশের গুণগত মান নষ্ট করে। কারণ বেশি শুকালে আঁশ ভঙ্গুর হয়ে যায়। আবার কম শুকালে পানি থাকায় আঁশ পচে যায়।

রিবন রেটিং পদ্ধতির গুরুত্ব

১। কোনো এলাকায় পাট পচানোর জন্য পানির অভাব হলে এ পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী।

২। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ছাল পচাতে জায়গা ও পানি কম লাগে।

৩। এ পদ্ধতিতে ছাল পচাতে প্রচলিত জাক পদ্ধতির অর্ধেক সময় লাগে।

৪। পচা ও দুর্গন্ধ পানিতে দাঁড়িয়ে আঁশ ছাড়াতে হয় না বিধায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ফলে এ পদ্ধতি স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব।

৫। আঁশে কাটিংস না থাকায় এবং গুণগতমানের আঁশ পাওয়ায় বাজার মূল্য বেশি পাওয়া যায়।

৬। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পাট খড়ি শক্ত, মজবুত ও টেকসই হয় এবং জ্বালানী সাশ্রয় হয়।

৭। প্রতি বিঘা জমির পাটের ছাল ছাড়াতে মাত্র ৪-৫ জন শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

৮। চাষীকে প্রচলিত পদ্ধতিতে জাক দেয়ার চিন্তা করতে হয় না।

৯। প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে খরচ কম হয়।

১০। এ পদ্ধতিতে ছাল পচানো পানি জমিতে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১১। সর্বোপরি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

রিবন রেটিং পদ্ধতির সতর্কতা

দেশি ও কেনাফ পাটের ছাল ছাড়ানো সহজ বিধায় এগুলো পানি স্বল্প এলাকায় চাষ করতে হয়। পাট চাষে অনুমোদিত মাত্রায় সার ব্যবহার করলে পাটের রিবনিং ভালো হয়। পাট গাছে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে রিবনিং করতে সমস্যা হয়। তাই ক্ষেতে আর্দ্রতা বা রস না থাকলে পাট কাটার ২-৩ দিন আগে হালকা সেচ দিতে হয়। পাতা ঝরানোর সাথে সাথে রিবনিং করতে হয়। কারণ রৌদ্রে পাট গাছ শুকিয়ে গেলে ছাল ছাড়াতে সমস্যা হয়। পাট পচন গর্তের চারদিকে উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাইরের পানি গর্তের মধ্যে ঢুকতে না পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাটের রিবন রেটিং পদ্ধতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষকের কাছে তা জমা দিন।

সারাংশ

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। এদেশে উৎপাদিত পাটের আঁশের মান খুবই ভালো। পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না এমন এলাকায় রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচানো হয়। রিবন রেটিং পদ্ধতির ধাপসমূহ হলো পাটের ছাল ছাড়ানো, ছাল পচানো, কম সময়ে ছাল পচানো, ছাল পচনের সমাপ্তি নির্ণয়, ছাল বা আঁশ ধৌতকরণ ও আঁশ শুকানো। রিবন রেটিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাটের কাঁচা ছাল ছাড়ানোর কৌশলকে কী বলে?

ক) রিবনার খ) রিবনিং

গ) রিবন ঘ) রিবন রেটিং

২। পাটের কাঁচা ছাল কম সময়ে পচানোর জন্য কী সার প্রয়োগ করা হয়?

ক) ইউরিয়া খ) টিএসপি

গ) এমওপি ঘ) জিপসাম

৩। প্রতি বিঘা জমির পাটের ছাল ছাড়াতে কত জন শ্রমিকের প্রয়োজ হয়?

ক) ২-৩ জন খ) ৪-৫ জন

গ) ৬-৭ জন ঘ) ৮-৯ জন

নিচের উদ্দীপকটি পড় ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

কৃষক রাশেদ পাট চাষ করার পর পাট গাছের কাঁচা ছাল মাটির চাড়িতে পচালেন।

৪। কোন পদ্ধতিতে পাট পচানো হয়েছিল?

i) প্রচলিত পদ্ধতিতে পাট পচানো হলো

ii) রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচানো হলো

iii) পাট পচানোর এ পদ্ধতিতে খরচ কম হলো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ রেশম চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সেরিকালচার বা রেশম চাষ কী তা বলতে পারবেন;
- তুঁত গাছের চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রেশম পোকার ডিম থেকে লার্ভা তৈরির কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- রেশম পোকার লার্ভা পালন সম্বন্ধে বলতে পারবেন;
- রেশম পোকার গুটি বা কোকুন সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গুটি থেকে সুতা তৈরির কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- রেশম পোকার জীবনচক্র (Life cycle) ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রেশম পোকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সেরিকালচার, তুঁত গাছ, রেশম পোকা, লার্ভা, কোকুন, জীবনচক্র।

রেশম পোকার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে *Bombyx mori* রেশম চাষে বেশি ব্যবহার করা হয়। এ পোকা তুঁত গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে বিধায় রেশম চাষীকে তুঁত গাছ চাষ করতে হয়। রেশম চাষ এর ইংরেজি হলো Sericulture। ল্যাটিন শব্দ 'Serio' থেকে Sericulture শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। 'Serio' শব্দের অর্থ Silk বা রেশম। রেশম পোকার খাদ্যের জন্য তুঁত গাছ চাষ করে এই পোকার লার্ভা পালন করে তাদের সৃষ্ট গুটি বা কোকুন থেকে রেশম সুতা আহরণ করার পদ্ধতিকে রেশম চাষ বলা হয়। তুঁত গাছ চাষ ও রেশম পোকার লার্ভা পালন ছাড়াও এ পোকার বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে অধিক উৎপাদনশীল রেশম পোকা উদ্ভাবন করা আধুনিক রেশম চাষের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু রেশম চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

রেশম চাষের ধাপসমূহ

১। তুঁত গাছ চাষ

বন্যামুক্ত ও সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি তুঁত গাছ চাষ করার জন্য উত্তম। বাড়ির চারিদিকে, পুকুর পাড়ে, রাস্তা ও রেললাইনের পাশে এবং পতিত জমিতে তুঁত গাছ চাষ করা হয়। এস ১, এসভি ৫, সি ৭৭৬, এস ৭৯৯ ইত্যাদি জাতের তুঁত গাছের চারা রোপণ করা যেতে পারে। কারণ উন্নত জাতের চারা থেকে ভালো ফলন পাওয়া যায়। বীজ, শাখা কলম, দাবা কলম, গুটি কলম ও কুঁড়ি সংযোজনের মাধ্যমে তুত গাছের বংশবিস্তার করা যায়। তবে বাংলাদেশে শাখা কলমের মাধ্যমে তৈরি চারাই বেশি ব্যবহৃত হয়। আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে ও আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে শেষ চাষের সময় প্রতি বিঘা জমিতে ৪০ কেজি পচা গোবর, ৫০ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি টিএসপি ও ১৫ কেজি এমপি সার শেষ চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। তবে পুকুর পাড়, রাস্তা ও রেল লাইনের পাশে গর্ত পদ্ধতিতে লাগানোর বেলায় সারগুলোকে একত্রে মিশিয়ে পরিমাণমত প্রতিটি গর্তের মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। সাধারণত সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬-৬.৫ ফুট এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩-৪ ফুট রাখতে হয়। তুঁত গাছ লাগানোর আসল উদ্দেশ্যই হলো পাতা সংগ্রহ। ভালো জাতের তুঁত গাছ থেকে অধিক পাতা সংগ্রহ করা যায়। রেশম পোকার লার্ভা তুঁত গাছের কচি বা নতুন পাতা খেয়ে বড় হতে থাকে। একবার লাগালে তুঁত গাছ ২০-২৪ বছর পর্যন্ত পাতা দিতে থাকে। নিয়মিত ডাল ছাঁটাই করা হলে নতুন ডাল ও পাতা গজায়। ধারালো দা বা চাকু দিয়ে পুরনো ডালের এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক অংশ কেটে ফেলতে হয়। সাধারণত চারা লাগানোর এক বছর পর বর্ষার শেষে তুঁত গাছের ডালপালা প্রথম ছাঁটাই করতে হয়। দুই থেকে আড়াই বছর পর নিয়মিতভাবে রেশম লার্ভার জন্য নতুন পাতা সংগ্রহ করা

যায়। তুঁত গাছের গোড়ায় প্রতি বছর অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়। বৃষ্টি না হলে মাঝে মাঝে সেচ দিতে হয়। আবার কোনো কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হয়। আগাছা বেশি হলে তা দমন করতে হয়। তুঁত গাছে পোকা ও রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পোকার মধ্যে উইপোকা, বিছাপোকা, লিফ হপার এবং রোগের মধ্যে লিফ স্পট, পাউডার মিলডিউ, মরিচা রোগ, শিকড় পচা রোগ ও নেমাটোড রোগ দেখা যায়। উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে এসব পোকা ও রোগ দমনের ব্যবস্থা নিতে হয়।

চিত্র ৫.৪.১ : তুঁত গাছ

২। তুঁত পাতা সংগ্রহ

সকালে অথবা বিকালে তুঁত গাছের পাতা সংগ্রহ করতে হয়। সকালে এমন সময় পাতা সংগ্রহ করতে হয় যেন ভেজা না থাকে। প্রখর রৌদ্রের সময় পাতা সংগ্রহ করা উচিত নয়। নতুন বা কচি পাতা তোলার পর তা পলিথিন ব্যাগে রেখে ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করতে হয়। প্রয়োজনে পলিথিন ব্যাগে ভেজা স্পঞ্জ ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাগের ভিতর যাতে তাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চব্বিশ ঘন্টায় লার্ভাকে বর্ষা মৌসুমে ৩ বার এবং শুষ্ক মৌসুমে ৫ বার পর্যন্ত খাবার দিতে হয়। লার্ভার বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়।

৩। রেশম পোকার লার্ভা বা পলু বা শুককীট সংগ্রহ

সাধারণত রেশম বীজাগার থেকে রেশম পোকার লার্ভা সংগ্রহ করতে হয়। ৪-৫ দিন বয়সী সুস্থ ও স্বাভাবিক লার্ভা চাষিদের মধ্যে বিতরণ বা সরবরাহ করা হয়। সকালে বা বিকেলে অথবা দিনের যে কোনো ঠান্ডা সময় হার্ডবোর্ডের তৈরি ছিদ্রযুক্ত বাক্স বা নেটের বাক্সে লার্ভা পরিবহণ করতে হয়। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকলে বাক্সের চারিদিকে ভেজা কাপড় বা ন্যাকড়া জড়িয়ে লার্ভা পরিবহণ করা আবশ্যক।

এছাড়াও রেশম পোকার কোকুন বা গুটি সংগ্রহ করেও লার্ভা পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে রেশম পোকার কোকুন বা গুটি সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে দিলে ১০-১২ দিন পর গুটি কেটে প্রতিটি কোকুন থেকে পুরুষ বা স্ত্রী মথ বের হয়ে আসবে। বের হবার পর পুরুষ ও স্ত্রী মথ যৌন সঙ্গমে মিলিত হবে। মিলনের ঘন্টা তিনেক পর পুরুষ মথটিকে সঙ্গমরত অবস্থা থেকে আলাদা করে নিতে হবে এবং স্ত্রী মথটিকে একটি কৌটার ভিতরে সাদা কাগজের ওপর রেখে তা ঢেকে দিতে হবে। স্ত্রী মথটি এ অবস্থায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে সাদা কাগজের ওপর ৩৫০০-৫০০০ টি পর্যন্ত ডিম পাড়বে। এবার কৌটার ভিতরকার ডিম সম্বলিত সাদা কাগজ বের করে তা ডালাতে রাখতে হবে এবং অন্য একটি ডালা দিয়ে তা ঢেকে রাখতে হবে। ডিমের ঘরে ২৫° সে. তাপমাত্রা ও ৭৫-৮০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকা উত্তম। বর্ণিত অবস্থায় রেখে দিলে ৮-৯ দিনের মাথায় ডিমে কালো ছিট দাগ পড়বে এবং ৯-১০ দিনের মাথায় পুরো ডিম কালো রং ধারণ করবে। এ ডিমগুলো শোধন করার জন্য ২% ফরমালিন দ্রবণের মধ্যে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পানি দ্বারা ধুঁয়ে নিতে হয়। ডিম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূলে থাকলে ২-৪ দিনের মধ্যেই ৯০-৯৫ ভাগ ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়ে আসবে।

৪। রেশম পোকার লার্ভা পালন

নিচের উপায়গুলো অনুসরণ করে রেশম পোকার লার্ভা পালন করা যায়।

(ক) **লার্ভা ঘর তৈরি :** মুক্ত আলো বাতাসযুক্ত উঁচু স্থানে লার্ভা ঘর তৈরি করতে হয়। এ ঘরের ক্ষেত্রফল ২২ ফুট × ১৬ ফুট হলে ভালো হয়। ঘরের দেয়াল মাটির ও ছাউনি খড়ের হলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। বায়ু চলাচল নিশ্চিত করার জন্য ঘরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দরজা ও জানালা রাখতে হয়। মাছি যাতে রেশম পোকার লার্ভাকে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য দরজা ও জানালায় তার জাল বা বাঁশের চিক লাগাতে হয়। লার্ভা ঘর যাতে স্যাঁতস্যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(খ) **লার্ভা পালনে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি :** লার্ভার ছোট অবস্থায় বাঁশের ছোট ডালা, বড় অবস্থায় বাঁশের বড় ডালা, ডালা রাখার জন্য কাঠ বা বাঁশের তাক, লার্ভার বেড বা ডালা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত ছোট লার্ভার জন্য ছোট ছিদ্রবিশিষ্ট জাল ও বড় লার্ভার জন্য বড় ছিদ্রবিশিষ্ট জাল, তাকের পায়ায় দেয়ার জন্য আলকাতরা বা পানির বাটি, তুঁত পাতা কাটার জন্য চাকু বা ছুরি, লার্ভার গা থেকে ছোপ পোকা ঝাড়ার জন্য পাখির পালক, গুটি করার জন্য বাঁশের চন্দ্রকী, ঘরের আর্দ্রতা বাড়ানোর স্পঞ্জ, শীতে ঘর গরম করার জন্য হিটার বা চুলা, ঘরের তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার, আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাপার জন্য আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র, শোধন করার জন্য ফরমালিন, চুন ইত্যাদি সরঞ্জামাদি ব্যবহৃত হয়।

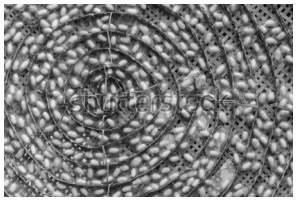

চিত্র ৫.৪.২ : রেশম চাষ

(গ) **লার্ভা ঘর ও সরঞ্জামাদি শোধন :** রেশম পোকার লার্ভা পালন শুরুর ২-৩ দিন আগেই যে সব জিনিসপত্র ব্যবহৃত হবে তাসহ লার্ভা ঘর শোধন করে নিতে হয়। ঘরের মেঝেসহ সকল সরঞ্জামাদি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কড়া রোদে শুকিয়ে নেওয়া উত্তম। এরপর ফরমালিন অনুমোদিত মাত্রা অনুযায়ী পানির সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে মেশিন দিয়ে মেঝেসহ ঘরের ভিতর সব স্থানে ও সরঞ্জামাদির ওপর স্প্রে করতে হয়। স্প্রে করার পর উক্ত ঘর ২৪ ঘন্টা বায়ুরোধী করে বন্ধ রাখতে হয়।

(ঘ) **লার্ভার পরিচর্যা :** রোগমুক্ত ও ভালো মানের লার্ভা সংগ্রহ করে রেশম চাষ শুরু করতে হয়। লার্ভা দেখতে পশমবিহীন ছাইয়া-ধূসর বা ক্রীম বর্ণের। লার্ভা প্রায় ৭-৯ সে.মি. লম্বা হয়। রেশম বা গুটি পোকার অনেকগুলো রেস (race) আছে। বছরে একবার ডিম ও গুটি উৎপন্ন করলে তাদেরকে একচক্রী (univoltine), বছরে দু'বার ডিম ও গুটি উৎপন্ন করলে তাদেরকে দ্বিচক্রী (bivoltine) এবং বছরে বহুবার ডিম ও গুটি উৎপন্ন করলে তাদেরকে বহুচক্রী (multivoltine) রেস বলা হয়। আমাদের দেশে বহুচক্রী রেস চাষ হয়। পালনের সময় ডালাতে লার্ভার ছোট অবস্থায় তুঁত পাতা কেটে টুকরো করে দিতে হয় এবং লার্ভার বড় অবস্থায় আস্ত পাতা দিলেও কোনো সমসা হয় না। পালনের সময় লার্ভার পায়খানা ও পাতার অবশিষ্টাংশ ডালা অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা করে ফেলে। এজন্য লার্ভার ছোট অবস্থায় ছোট ছিদ্রবিশিষ্ট জালের ওপর টুকরো টুকরো তুঁত পাতা দিয়ে ঐ জালটি ডালার ওপর বিছিয়ে দিলে লার্ভাগুলো জালের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে জালের ওপর খাবার খাওয়ার জন্য চলে আসবে। এমতাবস্থায় লার্ভাসহ ঐ জালটি অন্য ডালায় রেখে নোংরা ডালাটি পরিস্কার করা সম্ভব হয়। এমনিভাবে বড় ছিদ্রবিশিষ্ট জাল দিয়েও বড় লার্ভাগুলো স্থানান্তর করে নোংরা ডালা পরিষ্কার করা যায়। লার্ভাগুলো এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সময় দেহের খোলস বদলায়। এই খোলস বদলানোকে মোল্টিং (moulting) বলা হয়। খোলস বদলানোর সময় লার্ভাগুলো খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। এই লার্ভাগুলোতে পাঁচটি ইনস্টার (instar) পরিলক্ষিত হয়। ডিম থেকে বের হবার পর থেকে ১ম খোলস বদলানোর আগ পর্যন্ত সময়কে ১ম ইনস্টার, ১ম খোলস বদলানোর পর থেকে ২য় খোলস বদলানোর আগ পর্যন্ত সময়কে ২য় ইনস্টার, ২য় খোলস বদলানোর পর থেকে ৩য় খোলস বদলানোর আগ পর্যন্ত সময়কে ৩য় ইনস্টার, ৩য় খোলস বদলানোর পর থেকে ৪র্থ খোলস বদলানোর আগ পর্যন্ত সময়কে ৪র্থ ইনস্টার এবং ৪র্থ খোলস বদলানোর পর থেকে পিউপা বা পুত্তলী বা গুটি বা কোকুন তৈরির আগ পর্যন্ত সময়কে ৫ম ইনস্টার বলা হয়। রেশম পোকা সাধারণত ২২-২৩ দিন লার্ভা অবস্থায় থাকে। ১ম ইনস্টারে ৩ দিন ও ১ম খোলস বদলাতে ২০ ঘন্টা সময় লাগে। ২য় ইনস্টারে ২ দিন ও ২য় খোলস বদলাতে ২০ ঘন্টা সময় লাগে। ৩য় ইনস্টারে ৩ দিন ও ৩য় খোলস বদলাতে ১ দিন সময় লাগে। ৪র্থ ইনস্টারে ৪ দিন ও ৪র্থ খোলস বদলাতে ১ দিন সময় লাগে। ৪র্থবার খোলস বদলানোর পর কোকুন বা গুটি তৈরির পূর্বে ৬-৭ দিন লার্ভা অবস্থায় থাকে।

লার্ভার ১ম তকে ৩য় ইনস্টার পর্যন্ত ঘরের তাপমাত্রা ২৭° সে. ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৮৫% রাখতে হয়। আবার ৪র্থ ইনস্টার থেকে গুটি তৈরির আগ পর্যন্ত সময়ে ২৫-২৬° সে. তাপমাত্রা ও ৭০-৮০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা রাখা বাঞ্চনীয়। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ বা খোলা রেখে এবং ডালার চার পাশে পানিতে ভেজানো স্পঞ্জ রেখে ঘরের তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে।

(ঙ) **রেশম পোকার রোগ, পোকা, মাকড় ও কৃমি দমন :** বিভিন্ন রোগ রয়েছে, যেমন- পেব্রিন রোগ, ফ্লাচারি রোগ, জন্ডিস রোগ, প্যাটিন রোগ, মাসকারডাইন রোগ ইত্যাদি। এছাড়া উজি মাছি, ডার্মাস্টিক বিটল, মাকড়, কৃমি ইত্যাদিও রেশম পোকার শত্রু। তবে এগুলোর মধ্যে প্রধান শত্রু হলো উজি মাছি। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী উজি মাছি লার্ভার গায়ে ডিম পাড়ে। ১-২ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে ম্যাগট বের হয়। এই ম্যাগটগুলো লার্ভার দেহের ভিতরে ঢুকে পেশিকলা খেয়ে ফেলে। ফলে লার্ভা মারা যায়। এভাবে একটি উজিমাছি প্রায় ২০০-৩০০ টি রেশম লার্ভা মেরে ফেলতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করে বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ সমস্ত রোগ, পোকা, মাকড় ও কৃমি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

৫। রেশম গুটি সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

পঞ্চম ইনস্টার শেষ হবার পর লার্ভা যখন চুপচাপ ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে, তখন ঐ লার্ভাগুলোকে বাঁশের চন্দ্রকীতে স্থানান্তর করতে হয়। ৬ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট প্রস্থের একটি চন্দ্রকীতে প্রায় এক হাজার লার্ভা রাখা যায়। চন্দ্রকীতে রাখার পর এক পর্যায়ে লার্ভার মুখ থেকে তরল রেশমের ফোটা নিঃসৃত হয় যা সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে চন্দ্রকীতে আটকে যায়। শেষ পর্যায়ে লার্ভা নিজ দেহের চারিদিকে একটি আবরণ তৈরি করে যাকে কোকুন বা গুটি বলা হয়। চন্দ্রকীতে লার্ভা দেয়ার পর ঐ চন্দ্রকী লার্ভা ঘরের বাইরে বারান্দায় হেলানো অবস্থায় রাখতে হয়। এতে করে রেশম গুটির গুণগত মান ভালো হয়। লার্ভা ঘরে চন্দ্রকী রাখা উচিত নয়। কারণ ঘরের অবশিষ্ট লার্ভার ক্ষতি হয়। ২৩-২৪° সে. তাপমাত্রা ও ৭০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ভালো ও উন্নতমানের রেশম গুটি পাওয়া যায়। রেশম পোকার লার্ভা রেশম গ্রন্থি থেকে যে লালা নিঃসরণ করে তা থেকে রেশম তৈরি হয়। রেশম গ্রন্থি দেহের দু'পাশে অবস্থিত দুটো লম্বা ও পুরু প্রাচীরের থলে দ্বারা গঠিত যাদের সাধারণ একটি ছিদ্রপথে রেশম লালা নিঃসৃত হয়। রেশম পোকার লার্ভা যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন থলে দু'টো আঠালো তরল পদার্থে পূর্ণ হয়ে যায়। আর এই আঠালো তরল পদার্থ যখন বাইরে বেরিয়ে আসে তখন বাতাসের সংস্পর্শে তা শক্ত হয়ে গুটি বা কোকুনে পরিণত হয়। গুটি করা শেষ হলে লার্ভা পিউপায় বা মুককীটে রূপান্তরিত হয়। পিউপায় রূপান্তরিত হবার ২/১ দিনের মধ্যেই চামড়া শক্ত হয়ে বাদামি রং ধারণ করে। পিউপার চামড়া শক্ত হবার পর চন্দ্রকী থেকে রেশম গুটি ছাড়াতে হয়। রেশম গুটি ছাড়ানোর আগে চন্দ্রকী ১ দিন রোদে ও বাতাসে রেখে দিলে ভালো হয়। এতে করে গুটির শেল শক্ত হয় এবং নষ্ট কম হয়। গুটি ছাড়ানোর পর তা পরিষ্কার করে সুতা তৈরি বা রিলিং (reeling) এর জন্য বিক্রি করা হয়।

৬। সুতা তৈরি

রেশম গুটির ভিতরে পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ রেশম মথ বের হলে মথটি গুটির একদিকে কেটে বের হয়ে আসে। ফলে গুটির লম্বা সুতাটি অসংখ্য টুকরোয় পরিণত হয় এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এজন্য গুটির অক্ষত লম্বা সুতাটি পাওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ রেশম মথ বের হবার আগেই গুটিগুলো ৯০-৯৫° সে. তাপমাত্রার প্রায় ফুটন্ত পানিতে ৩-৪ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হয়। এর ফলে গুটির ভিতরের পিউপা বা মুককীট মারা যায় এবং গুটিতে রেশম সুতার সাথে লেগে থাকা আঠালো পদার্থ গলে যায়। এতে সুতা রিলে জড়ানোর উপযোগী হয়। এরপর গুটির মুখের সুতার প্রান্ত সুতা কাটা চরকি বা রিলের সাথে আটকিয়ে নিয়ে চরকির ঘূর্ণন অব্যাহত রাখলে গুটি থেকে সুতা মুক্ত হয়ে চরকি বা রিলের সাথে পেচাতে থাকে। চরকি বা রিলের মাধ্যমে গুটি থেকে সুতা উত্তোলনের এই পদ্ধতিকে রিলিং (reeling) বলে। চরকি বা রিলের মাধ্যমে উৎপাদিত এ সুতাকে কাঁচা রেশম (raw silk) বলা হয়। পরবর্তীতে এ কাঁচা রেশমকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রসেস করে রেশম বস্ত্র বয়ন করা হয়। পূর্ণতার শেষ পর্যায়ে এসে একটি রেশম লার্ভা প্রতি মিনিটে প্রায় ছয় ইঞ্চি সুতা তৈরি করতে পারে এবং সম্পূর্ণ গুটি বা কোকুন তৈরি করতে ৩ দিন সময় নেয়। একটি রেশম গুটি থেকে প্রায় ১০০০-৩০০০ ফুট সুতা পাওয়া যায় এবং ১ পাউন্ড রেশম সুতা পেতে প্রায় ২৫ হাজার গুটির প্রয়োজন হয়।

রেশম পোকার জীবনচক্র

রেশম পোকার জীবনে চারটি দশা বা ধাপ রয়েছে, যথা- ১। ডিম ২। লার্ভা বা শুককীট ৩। পিউপা বা মুককীট ও ৪। পূর্ণাঙ্গ মথ। এগুলো সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রেশমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

রেশমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

১। রেশম পোকা থেকে রেশমি সুতা পাওয়া যায়। এই রেশমি সুতা দ্বারা উন্নতমানের অতি মূল্যবান ও আরামদায়ক রেশমি কাপড় তৈরি হয়।

২। রেশম কাপড়ের দেশে ও বিদেশে যেমন চাহিদা রয়েছে তেমনি এর দামও বেশি।

৩। রেশম কাপড় বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব।

৪। জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৫। রেশম বস্ত্র কোমল ও নমনীয়। এই বস্ত্রে শতকরা ১১ ভাগ আর্দ্রতা বিদ্যমান থাকে। ফলে শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত সব ঋতুতেই এ কাপড় পরিধান করা আরামদায়ক হয়।

৬। অল্প মূলধন ও কম জায়গা কাজে লাগিয়ে রেশম চাষ করে অধিক অর্থ উপার্জন করা যায়। এত কম মূলধন ও জায়গা দিয়ে অন্য কোন ফসল চাষ বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড করা সম্ভব হয় না।

৭। আত্মকর্মসংস্থান তথা বেকারত্ব দূরীকরণের একটি সহজ উপায়। রেশম চাষ করলে পরিবারের বেকার সব লোকের কর্মসংস্থান হয়। এতে পরিবার তথা সমাজের ওপর একটা পজিটিভ প্রভাব পড়ে।

৮। রেশম চাষে ঝুঁকি কম। অর্থাৎ প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দাম কম হওয়া বা অন্য কোনো কারণে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৯। অধিক কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না বিধায় যে কেউ রেশম চাষ করে রেশম সুতা উৎপাদন করতে পারে।

১০। রেশম চাষে রেশম সুতার উৎপাদন খরচ কম, কিন্তু লাভ বেশি হয়।

১১। রেশম গুটি সিদ্ধ করে সুতা বা তন্তু ছাড়িয়ে নেয়ার পর মৃত পিউপা বা মুককীট হাঁস-মুরগি ও মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১২। রেশম গুটি থেকে সুতা আহরণের পর উচ্ছিষ্ট ছোবড়া থেকে সার্টিন তৈরি করা যায়। এছাড়াও কোর্সি কাটা দ্বারা বিশেষ বুনন প্রক্রিয়ায় গুটি থেকে কাপড় তৈরি করা হয়। বয়নকালের বর্জ্য পুনরায় ব্যবহার করে কার্পেট তৈরি করা যায়।

১৩। রেশম চাষে একই জমির তুঁত গাছ থেকে বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময় ৪-৫ বার তুঁত পাতা (তুঁত ফসল) পাওয়া যায় এবং তুঁত গাছ ২০-২৪ বছর বাঁচে বলে এক নাগাড়ে রেশম চাষ করে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়।

১৪। বাড়ির চারিদিকে, পুকুর পাড়ে, রাস্তা ও রেললাইনের পাশে এবং অনাবাদী ও পতিত জমিতে তুঁত গাছ আবাদ করে রেশম চাষ করা যায়। এতে ফসলী জমি নষ্ট হয় না।

১৫। তুঁত গাছ একবার লাগালে ২০-২৪ বছর বাঁচে বলে রেশম চাষে এর উৎপাদন খরচ কম হয়।

১৬। রেশম চাষের জন্য তুঁত গাছ আবাদে অধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, রেশম চাষের জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে তুঁত বৃক্ষ আবাদ করলে বছরে ১২-১৩ জন লোকের কর্মসংস্থান হয় অথচ অন্য ফসলে বছরে ৪-৫ জন লোক হলেই চলে।

১৭। মরা তুঁত গাছ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তুঁত গাছের অতিরিক্ত পাতা গবাদি-পশুকেও খাওয়ানো যায়।

১৮। রেশম কীট থেকে আহরিত তেল সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও রেশম সুতা অপারেশনের পর সেলাই কাজে ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সরেজমিনে রেশম চাষ পরিদর্শনপূর্বক তার ওপর একটি রিপোর্ট তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দিন।

সারাংশ

বাংলাদেশে *Bomlyx mori* প্রজাতির রেশম বেশি চাষ করা হয়। রেশম পোকার লার্ভা তুঁত গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে। এজন্য তুঁত গাছ চাষ করতে হয়। রেশম চাষে যে সমস্ত ধাপ অনুসরণ করতে হয় তা হলো - তুঁত গাছ চাষ, তুঁত পাতা সংগ্রহ, রেশম পোকার লার্ভা সংগ্রহ, লার্ভা পালন, রেশম গুটি সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সূতা তৈরি। রেশম পোকার লার্ভা সংগ্রহ করে খাবার হিসেবে তুঁত পাতা ব্যবহার করার পর এক পর্যায়ে তাদের তৈরি কোকুন থেকে সূতা তৈরি করার পদ্ধতিকেই রেশম চাষ বলে। আমাদের দেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু রেশম চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রেশম চাষের ইংরেজি কী?
ক) এপিকালচার খ) সেরিকালচার
গ) ফ্লোরিকালচার ঘ) লেককালচার

২। রেশম পোকা কোন গাছের কচি পাতা খায়?
ক) পেয়ারা খ) আম
গ) তুঁত ঘ) লিচু

৩। রেশম পোকার লার্ভায় কয়টি ইনস্টার পরিলিক্ষিত হয়?
ক) ৩ খ) ৪
গ) ৫ ঘ) ৬

নিচের উদ্দীপকটি পড় ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বিলাস মিয়া রেশম পোকার লার্ভা পালন করতে গিয়ে দেখলেন লার্ভার বয়স বৃদ্ধির শেষ পর্যায়ে লার্ভাগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

৪। রেশম পোকার লার্ভাগুলোর নিস্তেজ হওয়ার কারণ কী।
i) লার্ভা মরণ দশায় পৌঁছেছে
ii) লার্ভার কোকুন তৈরির সময় হয়েছে
iii) লার্ভাকে বাঁশের চন্দ্রকীতে স্থানান্তর করতে হবে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ মাশরুম চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাশরুম কী তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে চাষযোগ্য মাশরুমের নাম জানতে পারবেন;
- মাশরুমের পুষ্টিগুণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাশরুম চাষের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- স্ট্র মাশরুমের চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ওয়েস্টার মাশরুমের চাষ পদ্ধতি জানতে পারবেন;
- মাশরুম চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাশরুম, ছত্রাক, সবজি, ভেষজ, পুষ্টিগুণ, কার্যকরী খাবার, স্পন, তাজা মাশরুম, শুকনো মাশরুম, স্ট্র মাশরুম, ওয়েস্টার মাশরুম।

মাশরুম খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর একটি সবজি। এর ওষুধি বা ভেষজ গুণ রয়েছে। ছত্রাকবিদরা বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় দুই লক্ষেরও বেশি প্রজাতির ছত্রাক আবিষ্কার করেছেন। এই বিপুল সংখ্যক ছত্রাকের মধ্য থেকে অনেক যাচাই-বাছাই করে খাওয়ার উপযোগী প্রায় দুই হাজার ছত্রাক চিহ্নিত করেছেন যেগুলো মাশরুম হিসেবে গণ্য। এর মধ্যে প্রায় ৭৫ প্রজাতির ছত্রাক মাশরুম হিসেবে উৎপাদন করা যায়। মূলতঃ মাশরুম হলো ভক্ষণযোগ্য মৃতজীবী ছত্রাকের প্রজনন অঙ্গ। সুগন্ধ, রুচিসম্মত ও ভালো স্বাদের জন্য মাশরুম সকল মানুষের নিকট প্রিয় সবজি হিসেবে পরিচিত। পুষ্টিগুণ বিচারেও মাশরুম সেরা সবজির মধ্যে একটি। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় যেসব উপাদান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন, যেমন-আমিষ (protein), খাদ্য প্রাণ (vitamin) ও খনিজ পদার্থ (mineral) সেগুলো মাশরুমে উচ্চ মাত্রায় রয়েছে। মাশরুম চাষ করার জন্য কোনো উর্বর জমির প্রয়োজন হয় না। এটি ঘরেই চাষ করা সম্ভব। এটি চাষ করার জন্য দরকারি কাঁচামাল সস্তায় ও সহজে পাওয়া যায়। বর্তমান বিশ্বে মাশরুম চাষে মানুষের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলছে।

চাষযোগ্য মাশরুম

আমাদের দেশে বর্তমানে যে সমস্ত মাশরুম চাষ হচ্ছে তার একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো –

১। স্ট্র মাশরুম
২। ওয়েস্টার মাশরুম
৩। মিল্কী মাশরুম
৪। ঋষি মাশরুম
৫। শিতাকে মাশরুম
৬। বাটন মাশরুম
৭। পপলার মাশরুম ইত্যাদি।

মৌসুমের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে তিন শ্রেণির মাশরুম উৎপাদিত হয়। যথা –
১। গ্রীষ্মকালীন মাশরুম : এ ধরনের মাশরুম শুধু গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়। যেমন- স্ট্র, মিল্কী ও ঋষি মাশরুম।
২। শীতকালীন মাশরুম : এ ধরনের মাশরুম শুধু শীতকালে চাষ করা যায়। যেমন- বাটন, শিতাকে ও শিমাজী মাশরুম।
৩। উভয় মৌসুমী বা বছরব্যাপী মাশরুম : এ ধরনের মাশরুম সারা বছর ধরে চাষ করা যায়। যেমন- ওয়েস্টার, পপলার, ঝিনুক ও কান মাশরুম।

মাশরুমের পুষ্টিগুণ

পুষ্টিগুণ বিচারে মাশরুম নিঃসন্দেহে একটি সেরা সবজি। খাদ্য জগতে মাশরুমকে সবজি শ্রেণিতে ফেলা হয়, কিন্তু প্রায়োগিকভাবে এরা উদ্ভিদ নয়। এরা ছত্রাক জাতের অন্তর্ভুক্ত। সুস্বাদু খাবার হিসেবে এরা বেশ কিছু পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে থাকে। এরা হৃৎপিন্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া মাশরুমে মৌলিক পুষ্টি উপাদান, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং কাইটিন ও বিটা-গ্লুকান জাতীয় উপকারী আঁশ থাকায় দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ (chronic disease) প্রতিরোধে সহায়তা করে। মাশরুমে প্রোটিন, আঁশ, নিয়াসিন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন বি, ভিটামিন ডি, কপার, সেলেনিয়াম, পটাসিয়াম, অন্যান্য খনিজ যেমন- ফসফরাস, জিঙ্ক, ম্যাগেনেসিয়াম, কম পরিমাণ ফ্যাট, ক্যালরী ও সোডিয়াম বিদ্যমান থাকে। এতে কোনো কোলস্টেরল নেই। পাতলা করে কাটা এক কাপ কাঁচা সাদা মাশরুমে ১৫ ক্যালরি, ০ গ্রাম ফ্যাট, ২.২ গ্রাম প্রোটিন, ২.৩ গ্রাম কার্বহাইড্রেট, ০.৭ গ্রাম আঁশ ও ১.৪ গ্রাম সুগার থাকে। মাশরুমে কোন কোলস্টেরল থাকে না এবং প্রাকৃতিকভাবেই সোডিয়াম ও ফ্যাট কম থাকে বিধায় এটাকে কার্যকরী খাবার বলা হয়।

মাশরুম চাষের ধাপসমূহ

মাশরুম চাষে সাধারণত: যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে হয় তা ধারবাহিকভাবে নিচে আলোচনা করা হলো –
১। **চাষঘর তৈরি :** পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে এমন ঘরে মাশরুম চাষ করতে হয়। মাশরুম চাষের পরিবেশ খুবই স্পর্শকাতর। কারণ কাঙ্খিত পরিবেশ তৈরি না হলে মাশরুম উৎপাদন হয় না। এর চাষে পাঁচটি পরিবেশ বা মূলনীতি মেনে চলতে হয় যেমন —
(ক) অক্সিজেন : মাশরুম প্রধানত কাঠের গুড়া থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এই কাঠের গুড়া অক্সিজেনের উপিস্থিতিতে জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়ায় মাশরুমের খাবার সহজলভ্য করে দেয়। ফলে মাশরুমের ঘরে অক্সিজেনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা জরুরী।
(খ) আলো : মাশরুম ঘরটি হালকা বা আবছা অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে হবে। কারণ এই ধরনের আলো মাশরুম চাষের জন্য উপযোগী।
(গ) তাপমাত্রা : মাশরুম ২০-৩০° সে. তাপমাত্রায় ভালো জন্মায়। এজন্য মাশরুম ঘরের তাপমাত্রা ২০-৩০° সে. এর মধ্যে রাখতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে মাশরুম উৎপাদন ব্যাহত হবে। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য ঘরে সিলিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
(ঘ) আর্দ্রতা : মাশরুম আর্দ্র অবস্থা পছন্দ করে বিধায় ঘরে ৭০-৮০% আর্দ্রতা বজায় রাখা উচিত। এর চাষঘরে মাশরুম প্যাকেটের চারিদিকে উচ্চ মাত্রার আর্দ্রতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। মাশরুম বীজকে স্পন বলা হয়।
(ঙ) বায়ুপ্রবাহ : চাষ ঘরে অক্সিজেন দ্বারা কাঠের গুড়া জারিত হওয়ার ফলে প্রচুর CO_2 তৈরি হয় যা প্রজনন অঙ্গ বা ফুল তৈরিতে বাঁধা দান করে। এজন্য CO_2 কে বের করে দেয়ার জন্য ঘরের নিচের অংশে বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। **প্যাকেট বা স্পন সংগ্রহ :** যাচাই-বাছাই করে ভালো মানসম্পন্ন মাশরুম স্পন যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করতে হবে। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যাবলী থাকলে মাশরুম স্পনকে ভালো স্পন বলা যায় তা নিম্নরূপ —
ক) প্রতিটি প্যাকেট সুষমভাবে মাইসেলিয়াম দ্বারা পূর্ণ ও সাদা হবে।
খ) মাইসেলিয়ামের রঙ হলুদ, লাল বা কালো হওয়া চলবে না।
গ) প্রতিটি প্যাকেটের গঠন টাইট বা শক্ত হবে।
ঘ) প্যাকেটের গায়ে জাতের নাম ও ইনোকুলেশনের তারিখ লেখা থাকবে।

৩। **প্যাকেট বা স্পন পরিবহন :** সাধারণত: ঠান্ডা পরিবেশে প্যাকেট পরিবহন করতে হয়। দূরবর্তী কোনো স্থানে নেয়ার ক্ষেত্রে ট্রেন বা বাসের ছাদের ওপর রোদে বা ইঞ্জিনের ওপর গরম স্থানে রেখে বা বৃষ্টিতে ভিজিয়ে পরিবহন করা যাবে না। বাতাস চলাচল করতে পারে এমন কার্টুন বা বস্তায় ভরে প্যাকেট পরিবহন করতে হয়। কোনো কারণে যদি কয়েকদিন রেখে প্যাকেট কাটতে হয় সেক্ষেত্রে ২৫° সে. তাপমাত্রায় অর্থাৎ ঠান্ডা ঘরে আলাদা আলাদাভাবে ১৫-২০ দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। তবে প্যাকেট সংগ্রহের পরপরই যত দ্রুত সম্ভব ঠান্ডা সময়ে প্যাকেট কেটে চাষ ঘরে বসানো উচিত।

৪। **প্যাকেট বা স্পন কর্তন :** প্রতিটি প্যাকেট চাষ ঘরে স্থাপন করার আগে সঠিক পদ্ধতিতে কাটতে হবে। প্রত্যেক প্যাকেটে কোনাযুক্ত দুইটি কাঁধ থাকে। প্রতি কাঁধ বরাবর ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি ব্যাস করে উল্টো ডি আকারে কাটতে হবে। প্রত্যেক প্যাকেটের দুই কাঁধে দুইটি উল্টো ডি আকারে কাটা থাকবে। প্রতি প্যাকেটের উভয় পার্শ্বের এ কাটা জায়গার সাদা অংশ ব্লেড দিয়ে চেছে ফেলতে হবে। এই কাটা ও চাছা প্যাকেট উপুড় করে ৫-১৫ মিনিট পানিতে চুবিয়ে নেয়ার পর ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে চাষ ঘরের মেঝে অথবা তাকে সারি করে স্থাপন করতে হবে।

৫। **প্যাকেট বা স্পন তাকে স্থাপন :** চাষ ঘরের মেঝে বা তাকের ওপর প্যাকেট থেকে প্যাকেটের দূরত্ব ২ ইঞ্চি এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ২ ইঞ্চি বজায় রাখলে ভালো ফলন হয়। প্যাকেটের চারিদিকে ৭০-৮০% আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য গরমের সময় দিনে ৪/৫ বার, শীতে ও বর্ষায় দিনে ২/৩ বার পানি স্প্রে করা যেতে পারে যাতে প্যাকেট ও এর চারপাশে আর্দ্র অবস্থা বিরাজ করে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন প্যাকেটের কাটা জায়গার মাশরুম অঙ্কুরের ওপর ফোঁটার আঘাতে অঙ্কুর ভেঙ্গে না যায় এবং পানি জমে না থাকে। পানি স্প্রে করার সংখ্যা বা মাত্রা প্রয়োজনে কম বা বেশি হতে পারে। তবে সূর্য ওঠার আগে এবং সূর্য ডোবার পর পানি স্প্রে করলে মাশরুমের ফলন বেড়ে যায়।

৬। **তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ :** সুতি কাপড় বা খবরের কাগজ ভিজিয়ে প্যাকেটের ওপরে একটু উঁচু করে রেখে চাষ ঘরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনে স্প্রে মেশিন দিয়ে বৃষ্টির মতো পানি স্প্রে করে চাষ ঘরের দেয়াল ও মেঝে কয়েকবার ভিজিয়ে দিয়ে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কাঙ্খিত মাত্রায় বজায় রাখা যায়।

৭। **অন্যান্য পরিচর্যা :** মাশরুম একটি স্পর্শকাতর সবজি হওয়ায় চাষ ঘরের ভিতর ও বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্যাকেটে একসাথে অনেকগুলো অঙ্কুর দেখা গেলে সমআকারের স্বাস্থ্যবান মাশরুম পাওয়ার জন্য ছোট অঙ্কুরগুলো ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলতে হবে এবং প্রতি কাঁধ বা পাশের থোকায় ৮ থেকে ১২টি ফ্রুটিং বডি রাখতে হবে।

৮। **মাশরুম সংগ্রহ :** প্রথমবার মাশরুম তোলার পর পাকেটকে ১ দিন বিশ্রাম অবস্থায় রাখতে হয়। পরের দিন পূর্বের কাটা অংশ পুনরায় চেছে ফেলে আগের মতো পানি স্প্রে করতে হয়। একটি প্যাকেট থেকে ৫/৬ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়, তবে বাণিজ্যিকভাবে ২/৩ বারের বেশি সংগ্রহ করা উচিত নয়।

৯। **মাশরুম সংরক্ষণ :** কাঁচা মাশরুমে পানির পরিমাণ বেশি থাকায় সংরক্ষণকাল খুবই কম হয়। মাশরুম সংগ্রহ করার পরপরই এর রং এবং গঠনের দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। এজন্য সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করলে রং ও গঠন ঠিক রেখে বেশি দিন ব্যবহার করা সম্ভব হয়। কিছু নিয়ম মেনে চললে মাশরুম ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন- পরিপক্ক অবস্থা বা সঠিক সময়ে মাশরুম সংগ্রহ করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ঠান্ডা ও বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। মাশরুমকে তাজা ও শুকনো উভয় অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো –

(ক) তাজা মাশরুম সংরক্ষণ : মাশরুম তোলার ১২ ঘন্টা আগ পর্যন্ত পানি স্প্রে না করে তুললে তা ব্যাগে সিলিং করে ঘরের ঠান্ডা জায়গায় রেখে ২-৩ দিন পর্যন্ত খাওয়া যায়। এছাড়াও রেফ্রিজারেটরে ১০° সে. তাপমাত্রায় নরমাল চেম্বারে সিলিং অবস্থায় ৭-৮ দিন রেখে খাওয়া যায়। তাছাড়া ব্লানচিং করে লবণ দ্রবণে ৫-৬ মাস রেখে মাশরুম খাওয়া যায়। ব্লানচিং করার নিয়ম হলো- শতকরা ২ ভাগ লবণযুক্ত ফুটন্ত পানিতে ২-৫ মিনিট মাশরুম সিদ্ধ করে পরিস্কার ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিয়ে তা ২% লবণ ও ১% সাইট্রিক এসিড মিশ্রিত দ্রবণে বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করা।

(খ) শুকনো মাশরুম সংরক্ষণ : মাশরুম শুকানোর পর তা বায়ুরোধী প্যাকেটে ৫-৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়াও শুকানো মাশরুম ব্লেন্ডার মেশিন দিয়ে গুড়ো বা পাউডার করে বায়ুরোধী প্যাকেটে ৫-৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে খাওয়া যায়।

ভক্ষণযোগ্য মাশরুম বিভিন্ন পদ্ধতিতে আবাদ বা চাষ করা যায়। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে খড় (straw) দিয়ে এবং শীতকালে কম্পোস্ট দিয়ে যথাক্রম স্ট্র মাশরুম ও ওয়েস্টার মাশরুম চাষ করা হয়। নিচে স্ট্র মাশরুম ও ওয়েস্টার মাশরুম এর চাষ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

স্ট্র মাশরুম চাষ পদ্ধতি (Method of Straw Mushroom Culture**)**

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) মাশরুম বীজ বা স্পন (ii) ধানের খড় (iii) ৬০ সে.মি. × ৪০ সে.মি. সাইজের পাতলা পলিথিন ব্যাগ (iv) থার্মোমিটার (v) হাইগ্রোমিটার (vi) হ্যান্ড স্প্রেয়ার (vii) ব্লেড বা চাকু (viii) জীবাণুনাশক (ix) বালতি (x) কড়াই (xi) ছিদ্রমুক্ত কালো পলিথিন শীট (xii) ছিকা

চাষ প্রক্রিয়া : এক কেজি ধানের খড় ২-৩ ইঞ্চি আকারে কেটে নিয়ে একটি বেড প্রস্তুত করা যায়। কাটা খড় বালতিতে পরিস্কার পানি নিয়ে তাতে ১২ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে হয়। এরপর একটি বড় কড়াইয়ে প্রায় ৮৫° সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে বালতির খড়গুলো ৩০ মিনিট ধরে সিদ্ধ করতে হয়। এতে খড়ের মধ্যে থাকা জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। সিদ্ধ করা খড় কড়াই থেকে তুলে চাটাই বা পাকা মেঝের ওপর রেখে ঠান্ডা করতে হবে ও পানি ঝড়াতে হবে, কিন্তু শুকানো যাবে না। নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো মানের মাশরুম বীজ সংগ্রহ করে প্যাকেট থেকে বীজ বা স্পন বের করে এমনভাবে ছোট ছোট টুকরোয় ভাঙ্গতে হবে যাতে বীজযুক্ত প্রতিটি দানা পৃথক হয়ে যায়। প্রতি বেডের জন্য ১০০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। এখন ৪০-৫০ টি ছিদ্রযুক্ত একটি পলিথিন ব্যাগে পানি ঝড়ানো সিদ্ধ করা খড় ঢুকাতে হবে। বায়ু চলাচলের সুবিধার্থে পলিথিন ব্যাগে ছিদ্র করা হয়। প্রথমে পলিথিন ব্যাগের ভিতর ৪-৫ ইঞ্চি উঁচু করে খড়ের স্তর দিয়ে তার ওপর ২৫ গ্রাম মাশরুম বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর এই ছড়ানো মাশরুম বীজের ওপর আবার ৪-৫ ইঞ্চি উঁচু করে খড়ের স্তর বিছিয়ে পুনরায় ২৫ গ্রাম মাশরুম বীজ সমভাবে ছড়াতে হবে। এভাবে খড়ের ৪টি স্তরের ওপর ৪ বার মাশরুম বীজ ছড়ানোর পর পঞ্চমবার একইভাবে খড় বিছিয়ে পলিথিন ব্যাগের মুখ বেঁধে দিলেই একটি উপযুক্ত বেড প্রস্তুত হয়ে যাবে। চাষঘরের তাপমাত্রা ২৫-৩০° সে. এবং আর্দ্রতা ৮০-৯০% রাখা উচিত। পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে তাপ বাড়ানো যায়, আবার খুলে দিয়ে তাপ কমানো যায়। প্রস্তুতকৃত বেড চাষঘরের মাচার ওপর ১৪ দিন অন্ধকারে রেখে দিলে বীজ গজাবে এবং খড়ের চারিদিকে মাইসেলিয়াম দেখা যাবে। এ অবস্থাকে বীজ রানিং বলা হয়। এরপর অন্ধকার থেকে সরিয়ে নিয়ে পলিথিন ব্যাগ থেকে খড়ের বেড বের করে চাষ ঘরে মাচায় বা ছিকায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। সাবধানে বেড বের করলে ঐ পলিথিন পুনরায় ব্যবহার করা যায়। পলিথিন বেড থেকে বেড বের করার ৭-১০ দিন পরই মাশরুম সংগ্রহ করা যায়। এরকম বেড থেকে মোট ৩ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়। এ ধরনের বেডে প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে হ্যান্ড স্প্রেয়ার দিয়ে পানি স্প্রে করতে হয়। বেডকে পোকামাকড় ও অন্যান্য আপদের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়। উল্লেখ্য ১ কেজি ওজনের শুকনো খড়ের বেড থেকে ৬০০-৮০০ গ্রাম মাশরুম উৎপাদন সম্ভব।

ওয়েস্টার মাশরুম চাষ পদ্ধতি (Method of Wester Mushroom Culture**)**

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) মাশরুম বীজ বা স্পন (ii) কম্পোস্ট তৈরির জন্য কাঠের গুঁড়া ও ধানের কুড়া (iii) প্লাষ্টিক গামলা (iv) অটোক্লেভ (v) মোম লাগানো কাগজ ও তুলা (vi) চোষ কাগজ/চট (vii) তাক (viii) একটি সরু কাঠি (ix) পলিথিন ব্যাগ (x) হ্যান্ড স্প্রেয়ার।

চাষ প্রক্রিয়া : একটি বড় প্লাস্টিকের গামলায় ৩/৪ ভাগ শুকনো কাঠের গুঁড়া, ১/৪ ভাগ ধানের কুড়া ও পরিষ্কার পানি নিয়ে এমনভাবে মিশাতে হবে যেন মিশ্রণে চাপ দিলে ২/১ ফোটা পানি ঝরে। পরিস্কার পলিথিন ব্যাগে এই ভিজানো গুড়ার ৫০০ গ্রাম ভরতে হবে। একটি সরু কাঠি দিয়ে পলিথিন ব্যাগের ভিতর মাঝখান থেকে তলার দিকে চাপ দিয়ে একটি গর্ত করতে হবে। ব্যাগের মুখ মোমযুক্ত কাগজ ও তুলা দিয়ে বন্ধ করতে হবে। এরপর অটোক্লেভ দ্বারা ১০০° সে. তাপে ৩০-৪০ মিনিট ব্যাগগুলো শোধন করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। অটোক্লেভ থেকে ব্যাগ সরিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করার জন্য ২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। তারপর ব্যাগের ভিতর মাঝখানের ছিদ্র দিয়ে মাশরুম বীজ ঢুকিয়ে ব্যাগগুলো স্যাঁতস্যাঁতে ও অন্ধকার ঘরে ২০-২৫° সে. তাপমাত্রায় তাকের ওপর ২০ দিন রাখতে হয়। এতে সাদা মাইসেলিয়াম দিয়ে ব্যাগ ভরে যাবে। এই অবস্থায় ব্যাগগুলোর কাঁধ বরাবর উল্টো D আকৃতিতে কেটে নিতে হবে এবং প্রতিদিন ৪-৫ বার করে পানি স্প্রে করতে হবে। এ সময় ঘরে আলো বাতাস থাকা জরুরী। এমতাবস্থায় ১০-১৫ দিনের মধ্যেই মাশরুম গজাবে। উপরের অংশ ছাই রঙের হলে মাশরুম সংগ্রহ করতে হয়। একটি ব্যাগ থেকে ৬-৭ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়।

চিত্র ৫.৫.১ : মাশরুম স্পন

চিত্র ৫.৫.২ : মাশরুম চাষ ঘর

মাশরুমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১। মাশরুম সুস্বাদু ও পুষ্টিকার সবজি বিধায় নিয়মিত খেয়ে পুষ্টিহীনতা দূর করা যায়।

২। বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব।

৩। মাশরুমে ভেষজ গুণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।

৪। আবাদী জমির প্রয়োজন হয় না। ফলে ভূমিহীন কৃষক তাকে তাকে সাজিয়ে একটি ঘরকে কয়েকটি ঘরের সমান ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে এক একর জমির উৎপাদনকে বাড়িয়ে প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি করতে পারে।

৫। বাড়তি আয়ের উৎস। অন্য যে কোনো পেশার পাশাপাশি এটা চাষ করে একদিকে যেমন পরিবারের চাহিদা মেটানো যায়, অন্যদিকে বাড়তি আয়ও করা সম্ভব হয়।

৬। অল্প পুঁজি ও শ্রমের মাধ্যমে এটা চাষ করা যায়।

৭। মাশরুম চাষে বিনিয়োগকৃত অর্থ অতি দ্রুত তুলে আনা সম্ভব।

৮। চাষে সার ও বালাইনাশক ব্যবহৃত হয় না বলে মাশরুম স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব হয়।

৯। মাশরুম চাষে ব্যবহৃত প্যাকেট সর্বশেষে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১০। এক কেজি মাশরুম উৎপাদন করতে ৪০ টাকা খরচ হয় অথচ ২০০ টাকা বিক্রি করা যায়। অর্থাৎ প্রতি কেজিতে ১৬০ টাকা লাভ হয়।

১১। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, প্রতি হেক্টরে গরুর মাংস ও মাছ উৎপাদিত হয় যথাক্রমে ৭৮ কেজি ও ৬৭৫ কেজি। অথচ মাশরুম উৎপাদিত হয় ৬৫০০০ কেজি।

১২। চাষ শুরুর অল্প দিনের মধ্যে মাশরুম সংগ্রহ করা যায়, অথচ অন্য কোন ফসলে তা সম্ভব নয়।

১৩। মাশরুম চাষের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলা ও বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। ফলে সমাজ থেকে দারিদ্র্যতা দূর হবে।

১৪। সারা বছর মাশরুম চাষ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	''অল্প পুঁজি ও শ্রমের মাধমে মাশরুম চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব''- উক্তিটির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক একটি রিপোর্ট তৈরি করে তা শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দিন।

সারাংশ

মাশরুম এক প্রকার ছত্রাক। কিন্তু তা খাবার উপযোগী। এটা অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। এর ভেষজ গুণ রয়েছে। পুষ্টিগুণ বিচারে সেরা সবজির মধ্যে মাশরুম অন্যতম। এটা চাষ করতে উর্বর কোনো জমির দরকার হয় না। কম পুঁজি ও শ্রম দিয়ে ঘরেই মাষরুম চাষ করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে স্ট্র, ওয়েস্টার মিল্কী, ঋষি, শিতাকে, বাটন, পপলার ইত্যাদি জাতির মাশরুম চাষ হচ্ছে। মাশরুমে কোনো কোলেস্টেরেল থাকে না এবং প্রকৃতিগতভাবেই সোডিয়াম ও ফ্যাট কম থাকে বিধায় এটাকে কার্যকরী খাবার বলা হয়। মাশরুম চাষ করতে যে সমস্ত ধাপ অনুসরণ করা হয় তা হলো - চাষঘর তৈরি, স্পন সংগ্রহ, স্পন পরিবহণ, স্পন কর্তন, স্পন তাকে স্থাপন, ঘরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ, চাষঘরের ভিতর ও বাইরের কিছু পরিচর্যা, মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, এক কেজি মাশরুম উৎপাদন করতে ৪০ টাকা খরচ হলেও তা ২০০ টাকায় বিক্রয় করা যায়। বেকর যুবক-যুবতীর এটা চাষ করে স্বাবলম্বী হতে পারে। এছাড়াও কর্মক্ষম বা স্বাবলম্বী লোকেরাও বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে মাশরুম চাষ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাশরুম কী হিসেবে খাওয়া যায়?

ক) শাক খ) সবজি

গ) ফল ঘ) মূল

২। শীতকালীন মাশরুম কোন্‌টি?

ক) স্ট্র খ) মিল্কী

গ) বাটন ঘ) ঋষি

নিচের উদ্দীপকটি পড় ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আরিফ মিয়া তার বাড়ীর উঠানে একটি ঘর তুলে মাশরুম চাষ করলেন এবং এর পরিচর্যা করলেন।

৩। আরিফ মিয়ার কোন পরিচর্যা সঠিক?

i) চাষ ঘরের বাইরে পরিস্কারের প্রয়োজন ।

ii) ছোট অঙ্কুরগুলো কেটে ফেলেছেন।

iii) প্রতি থোকায় ৮-১২ টি ফ্রুটিং বডি রেখে দিয়েছেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এপিকালচার কী তা বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির মৌমাছি বর্ণনা করতে পারবেন;
- আধুনিক পদ্ধতির মৌমাছি পালন কী তা বলতে পারবেন;
- আধুনিক পদ্ধতির মৌমাছি পালন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মধু উৎপাদনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মৌমাছি Apiculture রাণী মৌমাছি, কর্মী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি, রয়েল জেলী, মৌবক্স, মধু

সাধারণতঃ কীটপতঙ্গের নাম শুনলেই আমরা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে থাকি। ধারণা করে থাকি এরা খুব ক্ষতিকর। ইহা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ অনেক পোকা আছে যা আমাদের প্রভূত উপকার করে থাকে। এর মধ্যে মৌমাছি অন্যতম। কারণ মধু ও মোমের জন্য মৌমাছি সকলের নিকট খুবই প্রিয়। এছাড়াও এরা ফসলের পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে ফলন অনেক বাড়িয়ে দেয়। মধু ও মোম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মৌমাছি পালন করার বিদ্যাকে মৌমাছি পালনবিদ্যা (Apiculture) বলা হয়। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মৌমাছি সংগ্রহ করে এনে মৌবাক্সে মৌচাকের উপযোগী কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন করাকে মৌমাছি চাষ বলা হয়। মৌমাছি একটি সামাজিক পোকা। এরা কলোনী তৈরি করে একসাথে বসবাস করে। এই পোকার মধ্যে শ্রমবিভাজন দেখা যায়। শ্রমবিভাজন অনুসারে এই পোকাদের ৩টি শ্রেণি বা কাস্টে বিভক্ত করা হয়। যথা – (১) রাণী মৌমাছি (২) কর্মী বা শ্রমিক মৌমাছি (৩) পুরুস মৌমাছি।

১। রাণী মৌমাছি (Queen Honeybee)

মৌমাছির যে কোনো কলোনীতে বা মৌচাকে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করার জন্য একটি মাত্র স্ত্রী মৌমাছি দেখা যায়, একে রাণী মৌমাছি বলা হয়। রাণী মৌমাছি কলোনীর সব মৌমাছির তুলনায় আকারে বড়। সে কলোনীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং রাণী-প্রকোষ্ঠে বাস করে। যৌন সঙ্গম ও ডিম পাড়া ছাড়া রাণী অন্য কেনো কাজ করে না। সে তার জীবদ্দশায় পুরুষ মৌমাছির সাথে এক বা একাধিকবার মিলনে যেতে পারে। কলোনীর বাইরে কুমারী রাণীর সাথে পুরুষ মৌমাছির মিলন হয়। মিলনের বাসনায় কুমারী রাণী শুষ্ক আবহাওয়ায় মৌচাকের বাইরে এসে উড়তে শুরু করলে চাকের পুরুষ মৌমাছিরা তার পিছু ছুটতে থাকে। পুরুষদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলার পর যে পুরুষটি যুদ্ধে জয়লাভ করে সর্বপ্রথম রাণীর কাছে পৌঁছাতে পারে সে পুরুষ মৌমাছিটির সাথেই কুমারী রাণী মিলনে লিপ্ত হয়। মিলনের পর পুরুষ মৌমাছিটি মারা যায়। মিলনের পর রাণী মৌমাছি গর্ভবতী হয়ে কলোনীতে ফিরে আসে এবং সময়মত ডিম দিতে শুরু করে। দেখা গেছে যে, একটি রাণী মৌমাছি তার দেহের জনন থলির মধ্যে প্রায় ২ কোটি শুক্রাণু জমা করে রাখতে পারে। একটি রাণী মৌমাছি গড়ে প্রতিদিন ৩০২১ টি করে ডিম দিতে পারে। এই রাণী মৌমাছি দু'ধরনের ডিম পেড়ে থাকে – ক) নিষেককৃত ডিম ও খ) অনিষেককৃত ডিম। নিষেককৃত ডিম থেকে কর্মী মৌমাছি এবং অনিষেককৃত ডিম থেকে পুরুষ মৌমাছি তৈরি হয়ে থাকে। মৌচাকের মধ্যে রয়েল জেলী থাকে। এই রয়েল জেলী মৌমাছির লার্ভাকে ৬-৭ দিন খাওয়ালে তা রাণী মৌমাছি এবং ৩ দিন খাওয়ালে তা কর্মী মৌমাছিতে পরিণত হয়। একই মৌচাকে একাধিক রাণী মৌমাছি থাকলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধে জয়ী রাণীই একমাত্র বেঁচে থাকে, বাকীরা মারা যায়। যে রাণী বেঁচে থাকে, কর্মী ও পুরুষ মৌমাছিরা তার নির্দেশ মেনে এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যত্র কলোনী তৈরি করে। তবে স্বাভাবিকভাবে একটি রাণী মৌমাছি নির্দিষ্ট সংখ্যক ডিম দেওয়ার পর সে মারা যায় এবং নতুন রাণীর উদ্ভব ঘটে।

২। কর্মী বা শ্রমিক মৌমাছি (Worker Honeybee)

কলোনীর সব মৌমাছির তুলনায় এরা আকারে সবচেয়ে ছোট। তবে খুবই শক্তিশালী ও পরিশ্রমী এবং এদের পেটের শেষ খন্ডাংশে একটি হুল থাকে। একটি কলোনীতে প্রায় ২০,০০০-৩০,০০০ কর্মী মৌমাছি থাকে। এরা বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি। এই মৌমাছির গায়ে লোম থাকে যা দেখতে চিরুনীর মত যা মধু ও পরাগ সংগ্রহে সহায়তা করে এবং এদের পিছনের দু'পায়ে পরাগ থলে থাকে। এদের কাজ হলো মৌচাক তৈরি করা, মৌচাক রক্ষা ও ব্যবস্থাপনা, মৌচাক পরিস্কার করা ও পাহারা দেয়া, মধু অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করা, রাণীকে খাওয়ানো ও রাণীর পরিচর্যা করা, বাচ্চাদের খাওয়ানো ও তাদের লালন পালন করা, মোম প্রস্তুত করা ইত্যাদি। একটি কর্মী মৌমাছি ৪২-১৮০ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

৩। পুরুষ মৌমাছি (Drone Honeybee)

এরা আকারে কর্মী মৌমাছির চেয়ে বড়, কিন্তু রাণী মৌমাছির তুলনায় ছোট। এরা সাধারণতঃ কালচে রঙের হয় এবং এদের শরীর বেশ শক্ত ও মজবুত হয়। তবে এরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। খাবারের জন্য এরা কর্মী মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল। জীবনের অধিকাংশ সময়ই এরা মৌচাকের মধ্যে ঘুমিয়ে সময় কাটায়। বাকী সময় উজ্জ্বল রোদে মুক্ত বাতাসে উড়ে বেড়িয়ে জীবনকে উপভোগ করে। প্রতিটি কলোনীতে স্বল্পসংখ্যক পুরুষ মৌমাছি থাকে। মৌসুম ছাড়া অন্য সময়ে কর্মী মৌমাছিরা আক্রমণ করে এদেরকে মেরে ফেলে। পুরুষ মৌমাছির প্রধান কাজই হলো রাণীর সাথে যৌন সঙ্গমে মিলিত হয়ে রাণীকে গর্ভধারণ করানো। রাণীর সঙ্গে যৌন মিলন হওয়ার পর পরই পুরুষ মৌমাছিটি মরে যায়। একটি পুরুষ মৌমাছি সাধারণতঃ ৯০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

চিত্র ৫.৬.১ : কর্মী, পুরুষ, রাণী মৌমাছি

আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন

পৃথিবীতে প্রায় ২০,০০০ বিভিন্ন প্রকার ভ্রমর জাতীয় মাছি (bee) আছে। এদের মধ্যে সারাবিশ্বে চার প্রজাতির মৌমাছি অর্থনৈতিকভাবে পরিচিত। তা হলো- ভারতীয় মৌমাছি (*Apis indica*), ইউরোপীয় মৌমাছি (*Apis mellifera*), বৃহদাকার বা পাহাড়ী মৌমাছি (*Apis dorsata*) ও ক্ষুদে বা ক্ষুদ্রাকৃতির মৌমাছি (*Apis florea*)। ইউরোপীয় মৌমাছি ছাড়া বাকী তিন প্রজাতির মৌমাছি বাংলাদেশে দেখা যায়। তবে মধু উৎপাদনের জন্য ভারতীয় মৌমাছি সবচেয়ে বেশি উপযোগি। এরা বেশ শান্ত স্বভাবের এবং খুব সহজে পোষ মানে। ফলে মৌমাছি পালকরা অনায়াসে এদের নিয়ে কাজ করতে পারে। কাঠ বা প্যাকিং বাক্স, কেরোসিনের টিন অথবা দেয়ালের কুঠুরীতে এদেরকে পালন করা হয়ে থাকে। এদেরকে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে কৃত্রিম বাসস্থান তৈরি করে সেখানে তাদের উপযোগি পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে পালন করাকেই আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন করা বোঝায়। নিচে আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো –

১। রাণী মৌমাছি সংগ্রহ : চার উপায়ে রাণী মৌমাছি সংগ্রহ করা যায়। যথা-

(ক) রাণী, বেশ কিছু কর্মী ও পুরুষ মৌমাছিসহ মৌবাক্স কিনতে পাওয়া যায়।

(খ) মাঠ ফসল বা উদ্যান ফসলে ফুল ধরার সময় জাল দ্বারা রাণীসহ কর্মী মৌমাছি ধরা যায়। জালে আটকানো রাণী মৌমাছিকে কাপড় বা ন্যাকড়া দ্বারা আস্তে করে ধরে কৃত্রিম মৌবাক্সের রাণীর কুঠুরীতে ঢুকিয়ে আটকিয়ে দিতে হয়। রাণী মৌমাছি চেনার উপায় হলো- আকারে সবচেয়ে বড়, খয়েরী বর্ণের ছোট হুল যা দেখতে ছুরির মত, ডানা ছোট এবং বুক বড় হয়।

(গ) গাছের ডাল, বাড়ী-ঘর বা দালান-কোঠার আনাচে কানাচে, মাঠির গর্ত বা গুহায় প্রাকৃতিকভাবে মৌমাছি কলোনী বা চাক তৈরি করে। কোনো জ্বালানী দ্বারা আগুনের ধুঁয়া তৈরি করে মৌচাকে ধুঁয়া লাগাতে হবে। কারণ মৌমাছিকে ধুঁয়া দ্বারা কাবু করা যায়। এতে পুরুষ ও কর্মী মৌমাছি মৌচাক ছেড়ে কাছাকাছি স্থানে সরে যাবে, কিন্তু রাণী মৌমাছি সরবে না। এই অবস্থায় মৌচাক থেকে সাবধানে রাণী মৌমাছিকে ধরে মৌবাক্সের রাণীর কুঠুরীতে আটকাতে হয়। সাধারণতঃ কম বা মাঝারী বয়সের মৌচাক থেকে রাণী সংগ্রহ করলে সহজে পোষ মানে। কিন্তু পুরাতন মৌচাকের রাণী সহজে পোষ মানে না।

(ঘ) আগুনের ধুঁয়া দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি মৌচাকের মৌমাছিকে সরাতে হয় অথবা শান্ত করতে হয়। পরে মৌচাকের অবস্থান বুঝে একটি কাঠি ঢুকিয়ে ছুরি বা চাকু দ্বারা মৌচাকের গোড়া কেটে দিয়ে চাককে আলাদা করা হয়। চাকের অপ্রয়োজনীয় ও পচা অংশ কেটে ফেলা হয়। চাকটি কাঠিতে এমনভাবে রাখতে হয় যেন ঝুলে থাকে। এই সময় রাণী মৌমাছি ঝাঁক হয়ে বসে থাকা মৌমাছিদের উপরে বা বাইরের দিকে থাকে। সেখান থেকে রাণী মৌমাছি সংগ্রহ করে মৌবাক্সের রাণীর কুঠুরীতে বসাতে হয়। কোনো কারণে রাণী মৌমাছিকে খুঁজে পাওয়া না গেলে ধুঁয়া বা হাত দ্বারা সকল মৌমাছিকে মৌবাক্সে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এতে সকল মৌমাছির সাথে রাণীর যাওয়ার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা থাকে। রাণী মৌমাছি মৌবাক্সে না ঢুকে থাকলে কর্মী মৌমাছিরা রাণীকে নিয়ে ঝাঁক বেঁধে বসে থাকে। সেখান থেকেও রাণী মৌমাছিকে সংগ্রহ করে মৌবাক্সের রাণীর কুঠুরীতে আটকানো যায়।

২। **সংগ্রহকৃত রাণী মৌমাছি মৌবাক্সে স্থাপন :** উপরে বর্ণিত যে কোনো পদ্ধতিতে রাণী মৌমাছি সংগ্রহ করে রাণীকে কুঠুরী বা খাঁচায় আটকিয়ে মৌবাক্সের ফ্রেমের ভিতর রেখে কুঠুরীর ঢাকনা বা মুখ খুলে দিলে কুঠুরী থেকে বের হয়ে রাণী ফ্রেমের ভিতর থাকে, কিন্তু মৌবাক্স থেকে বের হতে পারে না। কারণ মৌবাক্সের ছিদ্র তার জাল দিয়ে আটকানো থাকে। রাণী মৌমাছির আকার বড় বলে তারজালের ছিদ্র দিয়ে বের হতে পারে না। কিন্তু কর্মী ও পুরুষ মৌমাছি রাণীর চেয়ে আকারে ছোট বলে তারা তারজালের ছিদ্র দিয়ে মৌবাক্সের ভিতর সহজে আসা-যাওয়া করতে পারে। রাণী মৌমাছির দেহ থেকে এক ধরনের সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। এই সুগন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কর্মী ও পুরুষ মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে মৌবাক্সের ভিতর প্রবেশ করে। এভাবে মৌবাক্সে রাণীকে ৪-৫ দিন আটকিয়ে রাখার পর কর্মী মৌমাছিরা কলোনী বা মৌচাক তৈরি করা শুরু করে। তারপর মৌবাক্সের ঢাকনা খুলে দিলেও রাণী মৌমাছি কোথাও চলে যায় না। মৌবাক্সের প্রবেশ পথে একটি পাত্রের মধ্যে চিনির সিরা রেখে দিলে তা খেয়ে মৌমাছিরা স্বাভাবিক ও শান্ত থাকে।

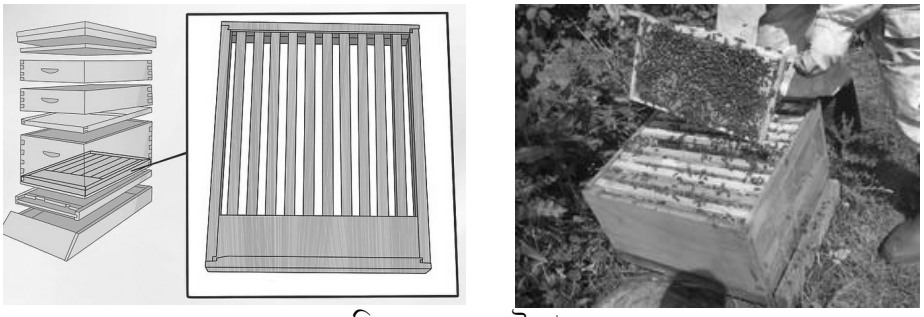

চিত্র ৫.৬.১ : মৌ বাক্স

৩। **মৌবাক্স উদ্যান বা ফসল মাঠে স্থাপন :** উদ্যান বা মাঠ ফসলের জমিতে ফুল ধরার আগে মৌবাক্সগুলোকে লোহা বা কাঠের তৈরি ৪ পায়া বিশিষ্ট ১.৫-২.০ ফুট উঁচু টুলের উপর স্থাপন করতে হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ফুলের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও সরিষা, তিল, তুলা, পিঁয়াজ, আম, জাম, লিচু, ভূট্টা প্রভৃতি ফুলের প্রতি মৌমাছির আসক্তি একটু বেশি। প্রতি হেক্টর সরিষার জমিতে ১০টি মৌবাক্স ১০০ মিটার দূরত্বে উত্তর-পূর্বমুখী করে বসাতে হয়। কারণ পূর্ব বা পশ্চিমমুখী করে বসালে রোদে মৌচাক নষ্ট হবে। আবার সোজা উত্তরমুখী করে বসালে শৈত্যপ্রবাহ এবং দক্ষিণমুখী করে

বসালে বৃষ্টির পানিতে মৌচাকের ক্ষতি হবে। মৌবাক্সে স্থাপনের সময় মৌমাছি প্রবেশ পথের সামনে যাতে ফাঁকা জায়গা থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এতে মৌমাছি সহজে চলাফেরা করতে পারে।
একটি উন্নত মৌবাক্স দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। মৌবাক্সের নিচের বড় কক্ষটি হলো বাচ্চার ঘর এবং উপরের ছোট কক্ষটি হলো মধু সঞ্চয়ের ঘর। বাক্সের সবার উপরে ঢাকনা ও সবার নিচে তলা থাকে। ঘর দুটোতে ৫-৭টি ফ্রেম থাকে এবং এই ফ্রেমেই মৌমাছিরা মৌচাক বাঁধে। বাচ্চা ঘরে ৭টি খোপ থাকে। এক খোপ থেকে পরবর্তী খোপের মাঝখানে ৮ মিলিমিটার ফাঁকা থাকে। খোপগুলোতে কাঠের ফ্রেম বসানো থাকে। রাণী মৌমাছি এই ফ্রেমে তৈরি করা চাকে ডিম পাড়ে ও বংশবিস্তার ঘটায়। বাচ্চা ঘর সবচেয়ে বড় ঘর। মৌবাক্সটি এক ফালি পুরু কাঠের ওপর বসাতে হয়। বাক্সটি কাঠের ওপর বসানোর পর উক্ত কাঠের সামনের দিকে কিছুটা জায়গা বাড়ানো থাকে যাকে পাটাতন বলা হয়। এই পাটাতনের ওপর মাঝে মাঝে মৌমাছিদের কৃত্রিম খাবার দেয়া হয়।

৪। **মৌবাক্স রক্ষণাবেক্ষণ :** কমপক্ষে প্রতি ৭ দিন পর পর মৌবাক্স পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তবে ঘন ঘন বাক্স খুললে বিশেষ করে বাচ্চার ঘর খুললে মৌমাছিদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। যদি শত্রু মথের আক্রমণ হয় তবে মৌচাক খুলে রোদে শুকাতে হয়। মৃত লার্ভা বা পিউপা বা বাক্সের তলায় মৌচাকের অন্য কোন ময়লা থাকলে তা পরিস্কার করে ফেলা উচিত। রাণীর ঘর তৈরি হলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। নচেৎ মৌচাক ছেড়ে মৌমাছিদের চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বংশবৃদ্ধিকালে বাচ্চা ঘরে নতুন ফ্রেম লাগাতে হবে। কোনো পুরনো অকেজো চাক বাক্সে থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে বয়স্ক রাণীকে সরিয়ে নতুন রাণীর সংযোজন করতে হবে। তা না হলে মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে যেতে পারে। মৌচাকে নবনির্মিত রাণী মৌমাছি, বাচ্চা ও পুরুষ মৌমাছিদের কঠুরীগুলো কেটে নষ্ট করে দিতে হবে। মৌমাছির বংশবিস্তার খুব বেশি হলে তাদেরকে একাধিক বাক্সে ভাগ করে দিতে হবে। আবার খাদ্য সংকটের কারণে মৌমাছির সংখ্যা কমে গেলে একাধিক বাক্সের মৌমাছি একত্র করে এক বাক্সে স্থানান্তর করা উচিত। প্রচুর ফুলযুক্ত স্থানে বাক্স স্থানান্তর করতে হয়। খাদ্য সংকট হলে চিনির সিরা তৈরি করে সরবরাহ করা উচিত। সিরা কোনো পাত্রে রেখে এর ওপর একটি পাতা বা কাঠি স্থাপন করতে হয় যাতে পাতা বা কাঠির ওপর বসে মৌমাছিরা সিরা খেতে পারে। চিনির সিরা রাতের বেলায় দেয়া উচিত যাতে এক বাক্সের মৌমাছি অন্য বাক্সে গিয়ে মারামারি করতে না পারে। ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে মৌবাক্সটির প্রবেশ পথ বৃষ্টি ও বাতাসের বিপরীতমুখী করে শুষ্ক ও নিরাপদ স্থানে রাখা উচিত। বাক্সের ওপর পলিথিন শীট দিয়েও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। প্রচন্ড শীতে মৌমাছিদের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য শীতের রাতে চট বা ছালা দিয়ে বাক্স ঢেকে রাখতে হয়। বাক্সে মৌমাছি পালনের সবচেয়ে খারাপ সময় হলো বর্ষাকাল। এজন্য এসময় খুব খেয়াল রাখতে হয়। বহু শত্রু আছে যারা মৌমাছির বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক উভয় অবস্থাতেই ক্ষতি করে। ওয়াক্স মথ, ওয়াক্স বিটল, বোলতা, পিঁপড়া, উইপোকা, তেলাপোকা, ব্যাঙ, ইঁদুর, টিকটিকি, রক্তচোষা ইত্যাদি মৌচাকের ক্ষতি করে থাকে। এছাড়াও নসিমা, একারাইন, সেপ্টিসিমিয়া ও প্যারালাইসিস রোগে মৌমাছিদের প্রচুর ক্ষতি হয়। এজন্য সময়মত যে কোনো কীটতত্ত্ববিদের পরামর্শ নিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৫। **মধু আহরণ :** মৌচাকের শতকরা ৭৫ ভাগ কুঠুরী মধু দ্বারা ভরে গেলে মৌমাছিরা মোম দ্বারা কুঠুরীর মুখ বন্ধ করে দেয়। এজন্য মৌচাকের উপর সাদা মোমের স্তর পড়লে বা সাদা চিক চিক করলে বুঝতে হবে মৌচাক মধু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। এবার জ্বালানী দিয়ে আগুনের ধুঁয়া মধু ঘরে লাগালে সব মৌমাছি চাক থেকে সরে পাটাতনের ওপর আসবে। তখন পুরো মৌচাকটি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এরপর কাপড় একটু একটু করে সরিয়ে মধুঘর থেকে ফ্রেমসহ মৌচাক বের করতে হয়। চাকে মৌমাছি থাকলে ব্রাশ দিয়ে তাদেরকে বাচ্চা ঘরে ঢুকিয়ে দিতে হয়। কোনো কোনো সময় মধু ঘরে মৌমাছি থেকে গেলে রাণীর কুঠুরীর সামনে মধু ঘর রেখে একটু নাড়াচাড়া বা বাতাস দিলে মৌমাছিরা বাচ্চা ঘরে ঢুকে যাবে। এই অবস্থায় মধু নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে মধু আহরণ করা হয়। মধু ভর্তি চাক বালতি বা গামলায় রেখে চাকু দিয়ে মৌচাকের মধু কোষের উপর থেকে মোমের সাদা স্তরটি কেটে ফেলতে হয়। এবার ফ্রেমসহ চাকটি মধু নিষ্কাশন যন্ত্রে রেখে আস্তে আস্তে যন্ত্রটির হাতল ঘুরালে ঐ যন্ত্রে মধু জমা হবে। এবার পরিষ্কার ছাকনি দিয়ে ছেঁকে মধু সংরক্ষণ করতে হবে। মৌমাছিরা তাদের প্রয়োজনে ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে লালার সঙ্গে মিশিয়ে মধু থলিতে করে মৌচাকে নিয়ে আসে। কর্মী মৌমাছিরা তাদের পাখা নেড়ে বাতাস সৃষ্টি করে সংগৃহীত রস থেকে পানি বাষ্পায়িত করে দেয়। খাঁটি মধু তৈরি হওয়ার পর সেগুলোকে চাকের নির্ধারিত প্রকোষ্ঠে জমা করে এবং মোম দিয়ে ঐ সমস্ত প্রকোষ্ঠের মুখ বন্ধ করে দেয়।

এক পাউন্ড মধু উৎপাদন করতে একটি কর্মী মৌমাছিকে চাক থেকে বের হয়ে ৪০০০০-৮০০০০ বার ফুল থেকে ফুলে বিচরণ করতে হয়। হিসেবে দেখা গেছে যে, এজন্য একটি কর্মী মৌমাছিকে ৩২০০০-৪২০০০ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করতে হয়।

মধু উৎপাদনের গুরুত্ব

১। মধু মহৌষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাশয়, কানপাকা, জিহবার ঘা, জন্ডিস, অর্শরোগ, সর্দি, কাশি, শ্বাসরোগসহ বিভিন্ন রোগের উপশম ছাড়াও জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২। মধু বলবৃদ্ধিকারক, পুষ্টিকর ও মিষ্টিদ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

৩। মধুতে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন-সি রয়েছে।

৪। মধুতে বিদ্যমান ডেক্সট্রোজ শরীরের দীর্ঘস্থায়ী শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

৫। মধু দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে।

৬। দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, P ইত্যাদি উপাদানের উৎস হিসেবে কাজ করে।

৭। বর্তমানে অনেক লোক মৌমাছি চাষের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এছাড়াও বনাঞ্চলের বহু মানুষ প্রাকৃতিক মধু সংগ্রহ করে তাদের জীবিকা চালাচ্ছে।

৮। মৌচাক থেকে প্রসেস করে মোম তৈরি করা হয়। এই মোম ক্রীমজাতীয় প্রসাধনীর প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৯। দরজা, জানালা, প্রাচীরের পুডিং তৈরিতে মোমের ব্যবহার হয়।

১০। জুতার কালি ও কার্বন পেপার তৈরিতে মোম ব্যবহৃত হয়।

১১। রৌপ্যকাররা বিভিন্ন কাজে মোম ব্যবহার করে থাকেন।

১২। বিভিন্ন শিল্প কর্ম ও বাটিকের কাজে মোম ব্যবহৃত হয়।

১৩। বিভিন্ন আসবাবপত্র, জ্বালানী তেল ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরিতেও মোমের ব্যবহার হয়।

১৪। রঙ, বার্ণিশ, সেভিং ক্রীম ও লিপস্টিক তৈরির কাঁচামাল হিসেবে মোম ব্যবহৃত হয়।

১৫। মৌমাছি পালনে মধু উৎপাদনের পাশাপাশি ফসলের পরাগায়ন ভালভাবে হওয়ায় ফলন প্রায় ২০-৩০% বেশি হয়।

১৬। মধু উৎপাদন করা খুব কঠিন নয়। একবার মৌবাক্স স্থাপন করলে সারা বছর মধু পাওয়া সম্ভব। একবার তৈরি করা বাক্স দিয়ে কয়েক বছর মধু পাওয়া যায়।

১৭। অন্য যে কোনো পেশার পাশাপাশি মধু উৎপাদন করে বাড়তি উপার্জন করা সম্ভব।

১৮। মধু উৎপাদনে কম পুঁজি খাটিয়ে বেশি লাভ করা সম্ভব।

১৯। বেকার লোকেরা মৌচাষ করে মধু উৎপাদনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি করে অনায়াসে স্বাবলম্বী হতে পারে।

২০। শস্য শ্যামল বাংলাদেশে মৌচাষ করে মধু উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণের পর বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	মৌবাক্সে কীভাবে মৌমাছি চাষ করা হয় তা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দিন।

সারাংশ

মৌমাছি শিল্প পতঙ্গের একটি। এটি সামাজিক পোকা। কলোনী তৈরি করে এরা একসাথে বসবাস করে। এদের মধ্যে শ্রম বিভাজন দেখা যায়। এদেরকে তিনটি শ্রেণী বা কাস্টে বিভক্ত করা হয়েছে - রাণী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি ও শ্রমিক মৌমাছি। কোনো কলোনী বা মৌচাকে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করার জন্য শুধু একটি মৌমাছি দেখা যায়, একে রাণী মৌমাছি বলা হয়। রাণী আকারে সবচেয়ে বড়। পুরুষ মৌমাছিরা খুব অলস হয়। খাবারের জন্য এরা শ্রমিক মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল। আকারে শ্রমিক মৌমাছিরা তুলনায় বড়, কিন্তু রাণীর চেয়ে ছোট আকৃতির হয়। শ্রমিক মৌমাছিরা আকারে সবচেয়ে ছোট, কিন্তু খুবই শক্তিশালী ও পরিশ্রমী হয়। একটি মৌচাকে প্রায় ২০,০০০-৩০,০০০ শ্রমিক মৌমাছি থাকে। এরা বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি। আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনে যে সমস্ত পন্থা অনুসরণ করতে হয়, তা হলো- রাণী মৌমাছি সংগ্রহ, রাণীকে মৌবাক্সে স্থাপন, মৌবাক্স ফসল মাঠে স্থাপন, মৌবাক্স রক্ষণাবেক্ষণ ও মধু আহরণ। মধু ও মোম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মৌমাছি পালন করার বিদ্যাকে এপিকালচার বলা হয়। মৌচাষ করে অনেক লোক মধু সংগ্রহ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। একটি মৌচাকে রাণী মৌমাছি কয়টি থাকে?
ক) ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ) ৪

২। মধু উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে কোন্ মৌমাছি বেশি উপযোগি?
ক) ইউরোপীয় মৌমাছি খ) পাহাড়ী মৌমাছি
গ) ভারতীয় মৌমাছি ঘ) ক্ষুদে মৌমাছি

৩। মৌচাকের নিকট আগুনের ধুঁয়া নিয়ে গেলে -
i) মৌমাছিরা মৌচাক থেকে সরে যায়।
ii) মৌমাছিরা শান্ত হয়ে যায়।
iii) মৌমাছিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ধুঁয়া বহনকারীকে কামড়ানো শুরু করে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৭ গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- কৃত্রিম প্রজননের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা ও অসুবিধা বলতে পারবেন;
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গবাদি পশু, কৃত্রিম প্রজনন, অনুন্নত, উন্নত ষাড়, বীর্য বা শুক্রাণু, গাভী বা বকনা জরায়ু

কৃত্রিম প্রজনন ব্যাখ্যা করার পূর্বে প্রজনন কী তা জানতে হবে। যে শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতির মাধ্যমে জীব তার বংশ রক্ষা করে এবং একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন জীবের আবির্ভাব ঘটায় তাকে প্রজনন বলে। এই প্রজনন দু'ভাবে হতে পারে। যথা-১। প্রাকৃতিক উপায়ে ২। কৃত্রিম উপায়ে। ডাকে আসা বা গরম হওয়া বকনা বা গাভীকে ষাঁড় দ্বারা সরাসরি পাল দেয়াকে প্রাকৃতিক প্রজনন বলে। এই প্রাকৃতিক প্রজনন মাঠে-ঘাটে সকলের অগোচরে ঘটতে পারে। আবার গরম হওয়া বকনা বা গাভীর মালিক নিজে ষাঁড়ের নিকট নিয়েও এ কাজ করাতে পারেন। তবে প্রাকৃতিক প্রজনন প্রক্রিয়ায় গরুর জাতকে কখনও উন্নত করা যায় না। দেশী বা অনুন্নত গরুর জাতকে উন্নত করতে চাইলে অবশ্যই উন্নত ষাঁড়ের বীর্য নিয়ে কৃত্রিম প্রজনন ঘটাতে হবে। কৃত্রিম উপায়ে ষাঁড় থেকে সিমেন বা বীর্য সংগ্রহ করার পর বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই বীর্য দিয়ে ডাকে আসা বকনা বা গাভীকে প্রজনন করিয়ে গর্ভবতী করার প্রক্রিয়াকেই কৃত্রিম প্রজনন বলা হয়। উন্নতজাতের ষাঁড়ের বীর্য সংগ্রহ করে দেশীয় অনুন্নত গাভী বা বকনাকে প্রজনন করানো হলে উন্নত ষাঁড়ের গুণাবলী বাচ্চার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই কৃত্রিম প্রজনন খুবই প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণাধীন নিজস্ব অথবা বেশ কিছু বেসরকারী বা সমবায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে। এসব কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে দেশীয় গাভী বা বকনাকে কৃত্রিম প্রজনন করানো যায়। এজন্য কাঙ্খিত উন্নতজাতের ও ভালো মানের ষাঁড় নির্বাচন করতে হয়। ষাঁড়ের যে সমস্ত গুণাবলি থাকা দরকার তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো —

১। ষাঁড়কে অবশ্যই সুস্থ-সবল ও সতেজ হতে হবে।

২। ষাঁড়কে সর্ব প্রকার রোগমুক্ত হতে হবে। এমনকি বংশগত কোন রোগ থাকলেও চলবে না।

৩। ষাঁড়ের মাতাকে অবশ্যই অধিক দুধ বা মাংস উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং উন্নত জাতের হতে হবে।

৪। ষাঁড়ের শুক্রাণু অবশ্যই উর্বর হতে হবে।

৫। ষাঁড়ের বয়স কমপক্ষে ২-৩ বছর হবে। তবে জাতভেদে এ বয়স কম বা বেশি হতে পারে।

৬। ষাঁড়ের দেহ বা গায়ের রঙ খুবই আকর্ষণীয় হতে হবে। কারণ কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বাচ্চার গায়ের রঙ ষাঁড়ের মত হয়।

৭। ষাঁড়ের স্বাস্থ্য মধ্যম মানের হওয়া উত্তম।

৮। ষাঁড়ের গায়ে বা দেহে কোনো পরজীবী থাকা চলবে না।

৯। ষাঁড়ের মেজাজ শান্ত প্রকৃতির হতে হবে।

কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহারের আগে ষাঁড়কে সুষম খাদ্য ও প্রচুর পানি খাওয়াতে হয়। ষাঁড়কে কোনো প্রকার ভয়-ভীতি দেখানো যাবে না বা কোনো ভারবাহী কাজে ব্যবহার করা যাবে না। নিয়মিত গোসলসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় ষাঁড়কে রাখতে হবে। এছাড়াও ষাঁড়টি কৃত্রিম প্রজননের জন্য উপযুক্ত কিনা সেজন্য নিয়মিত পশু ডাক্তার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করানো উচিত।

কৃত্রিম প্রজননের ধাপসমূহ

গরুর কৃত্রিম প্রজননের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয় —

১। **বীর্য সংগ্রহ :** নিচের যে কোনো একটি পদ্ধতির মাধ্যমে বীর্য সংগ্রহ করা যায়।

(ক) প্রাকৃতিক প্রজননের পর বকনা বা গাভীর যোনিপথ থেকে বীর্য সংগ্রহ করা যায়।

(খ) ষাঁড়ের মলদ্বার নাড়াচাড়া করলে যৌনভাবে উত্তেজিত হয়ে বীর্যপাত ঘটায়। এ সময় বীর্য সংগ্রহ করা যায়।

(গ) বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মাধ্যমে ষাঁড়কে যৌনভাবে উত্তেজিত করলে বীর্যপাত ঘটায়। এসময়ও বীর্য সংগ্রহ করা যায়।

(ঘ) কৃত্রিম যোনি পদ্ধতি যাকে ইংরেজিতে Artificial Vagina Method বা AV পদ্ধতি বলা হয়। আমাদের দেশসহ সারাবিশ্বে এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। কারণ এটি অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম যোনি তৈরি করতে নির্দিষ্ট মাপের একটি শক্ত রাবারের নলের মধ্যে একটি পাতলা রাবারের নল ঢুকাতে হয়। নল দুটোকে এমনভাবে সেট করতে হয় যাতে দুনলের মধ্যবর্তী জায়গায় পানি দিলে তা বের হতে না পারে। এরপর নলের একপ্রান্তে রাবারের পাতলা টিউব লাগিয়ে অপরপ্রান্তে কাঁচের টিউব লাগাতে হয়। এবার নল দুটোর মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থানে গরম পানি দিয়ে কৃত্রিম বা নকল যোনির তাপমাত্রা বকনা বা গাভীর যোনির তাপমাত্রার সমপর্যায়ে রাখতে হয়। এখন বিশেষভাবে তৈরি একটি খোয়াড় বা ট্রাভিসে একটি খোঁজাকৃত ষাঁড় গরু (যাকে ডামি নামে অভিহিত করা হয়) দাঁড় করিয়ে কাঙ্খিত ষাঁড়কে কাছে আনলে উত্তেজিত হয়ে বকনা বা গাভীর উপর উঠে ষাঁড়টি লিঙ্গ বের করবে। লিঙ্গ বের হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম যোনির ভিতর তা ঢুকিয়ে দিতে হবে। উত্তেজিত ষাঁড় এই কৃত্রিম যোনিকে গাভীর যোনি মনে করে বীর্যপাত ঘটাবে। সেই বীর্য রাবারের পাতলা নল দিয়ে কাঁচের টিউবে জমা হবে। বীর্যভর্তি কাঁচের টিউব কৃত্রিম যোনি থেকে খুলে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা হয়।

২। **বীর্য পরীক্ষা :** পাঁচটি উপায়ে বীর্যের গুণাগুণ বা মান পরীক্ষা করা যায়। যথা-

(ক) বীর্যের আয়তন মেপে : সংগৃহীত বীর্য আয়তন মাপক নলের সাহায্যে মেপে যদি দেখা যায় যে, একটি ষাঁড় থেকে প্রতিবার গড়ে ৫-৮ সিসি বীর্য পাওয়া গিয়েছে, তবে তা উপযুক্ত পরিমাণ বলে ধরে নেয়া যাবে।

(খ) বীর্যের রঙ দেখে : ভালো বীর্যের রঙ সাধারণত ক্রীমের মতো ধূসর বা হালকা ধরনের হয়। এর বাইরে হলুদ, লালচে, রক্ত মেশানো, পুঁজ বা প্রস্রাব মেশানো থাকলে সেই বীর্য ব্যবহারের অনুপযুক্ত হবে।

(গ) বীর্যের ঘনত্ব দেখে : সুস্থ ও সবল ষাঁড়ের বীর্যের ঘনত্ব ক্রীমের ঘনত্বের মতো হয়ে থাকে। অপরদিকে অসুস্থ বা দূর্বল ষাঁড়ের বীর্য পানির মতো হয় যা ব্যবহারের অনুপযোগী।

(ঘ) অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বীর্য পরীক্ষা : বীর্য সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে এক ফোঁটা বীর্য স্লাইডে নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা শুক্রাণুর নড়াচড়ার গতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। বীর্যের এই গতিকে ০-৫ গ্রেডে ভাগ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ শুক্রাণু নড়াচড়া না করলে তার গ্রেড হবে ০ (শুন্য) যা ব্যবহারের অনুপযোগী। এই গ্রেড যত বাড়বে সেই বীর্য তত ভাল মানের হবে।

(ঙ) বীর্যের রাসায়নিক পরীক্ষা : সংগৃহীত বীর্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে কয়েক ফোঁটা মিথাইল ব্লু মিশিয়ে ১১০-১১৫° সে. তাপমাত্রায় একটি টেস্ট টিউবের পানির সাথে মিশ্রিত করলে নীল রঙ ধারণ করে। যদি এই নীল রঙ ৩-৬ মিনিটের মধ্যে চলে যায় তবে তা ভালো মানের বীর্য হবে। আর তা না হলে সেই বীর্য ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলে ধরতে হবে।

৩। **বীর্য তরলীকরণ :** বকনা বা গাভীর গর্ভধারণের জন্য একটি মাত্র উর্বর শুক্রাণুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বীর্যে অসংখ্য শুক্রাণু থাকে এবং অত্যন্ত ঘন থাকে। ঘন বীর্য কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার করলে অপচয় হয়। কারণ কৃত্রিম প্রজননে এই ঘন বীর্যকে পাতলা বা তরল করে অনেক বেশি বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানো সম্ভব হয়। কুসুম-সাইট্রেট দ্রবণের মাধ্যম বীর্যকে তরল করা হয়। প্রথমে ২-৯ গ্রাম সোডিয়াম সাইট্রেট ও ১০০ মিলিলিটার পাতিত (distilled) পানি একসাথে মিশিয়ে সাইট্রেট সলিউশন তৈরি করা হয়। পরে ২ ভাগ সাইট্রেট সলিউশনের সাথে ১ ভাগ ডিমের কুসুম মিশিয়ে কুসুম-সাইট্রেট দ্রবণ তৈরি করা হয়। পরে এই কুসুম সাইট্রেট দ্রবণের সাথে বীর্য মিশিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তরল করে নিতে হয়। উল্লেখ্য এসব ডাইলুয়েন্ট বা তরীলকারক শুক্রাণুর জন্য পুষ্টি জোগান দিয়ে থাকে।

৪। **বীর্য সংরক্ষণ :** সংগৃহীত বীর্যকে তরল করার পর সংরক্ষণ করে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা হয়। তরল বীর্যকে সধারণত: দুভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যথা —

(ক) স্বল্প সময়ের জন্য রেফ্রিজারেটর বা বরফযুক্ত থার্মোফ্লাক্সে বীর্য সংরক্ষণ : তরলীকৃত বীর্যকে টেস্ট টিউবে রেখে রেফ্রিজারেটরে ৩-৫° সে. তাপমাত্রায় ২-৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়। কিন্তু যখন দূর দূরান্তে বীর্য নেয়ার প্রয়োজন হয়, সে সময় রেফ্রিজারেটর থেকে বীর্য বের করে দূরে কোথাও নেয়ার পথে বাইরের তাপমাত্রায় উক্ত বীর্য নষ্ট হয়ে যায়। কারণ ঐ তাপমাত্রা বীর্য সহ্য করতে পারে না। এজন্য থার্মোফ্লাক্সের ভেতর বরফ দিয়ে তার মধ্যে বীর্য ভর্তি ঐসব টেস্টটিউব রেখে পরিবহণ করলে কোনো সমস্যা হয় না। এভাবে বীর্য ৩ দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত বীর্যকে তরল বীর্য বলা হয়।

(খ) দীর্ঘ সময়ের জন্য তরল নাইট্রোজেন ভর্তি সিমেন ক্যানে বীর্য সংরক্ষণ : এটি হলো বীর্য সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তরলীকৃত বীর্য ছোট ছোট নল বা স্ট্রতে ভরে তরল নাইট্রোজেন ভর্তি সিমেন ক্যানের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে সংরক্ষণ করা হয়। এরূপ প্রতিটি নলে প্রতি মাত্রা বীর্যে ২০-৩০ মিলিয়ন শুক্রাণু থাকে। তরল নাইট্রোজেনে -১৯৬° সে. তাপমাত্রায় বীর্যকে ২৫ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব। বীর্যের কার্যক্ষমতা ভালো রাখার স্বার্থে বীর্য ভর্তি নল বা স্ট্র সার্বক্ষণিক তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এজন্য সিমেন ক্যানে তরল নাইট্রোজেনের পরিমাণ অবশ্যই ১০ সে.মি. বা তার চেয়ে বেশি রাখা উত্তম। সাধারণত ২ লিটার মাপের একটি সিমেন ক্যান প্রতি ৪-৫ দিন পর পর তরল নাইট্রোজেন দ্বারা ভরতে হয়। এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত বীর্যকে হিমায়িত বীর্য বলা হয়।

৫। বকনা বা গাভীতে বীর্য প্রয়োগ পদ্ধতি

(ক) তরল বীর্য প্রয়োগ পদ্ধতি : রেফ্রিজারেটর বা থার্মোফ্লাক্সে রাখা টিউব হতে ১ মি.লি. বীর্য নিডলের সাহায্যে সিরিঞ্জের মধ্যে ভরতে হবে। এই সিরিঞ্জের সঙ্গে এ.আই. টিউব লাগানোর পর টিউবটিতে গ্লিসারিন মাখিয়ে পিচ্ছিল করে নিতে হবে। এরপর বাম হাতে গ্লোবস পরে সেই হাত গরম হওয়া বকনা বা গাভীর মলদ্বার দিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে জরায়ু ধরতে হবে। ডান হাত দিয়ে সিরিঞ্জ ধরে টিউবটি বকনা বা গাভীর যোনিতে প্রবেশ করাতে হবে যাতে টিউবের প্রান্তটি বাম হাত দ্বারা ধরা যায়। তবে টিউবটি যেন জরায়ুতে প্রবেশ না করে। এখন সিরিঞ্জের পিস্টন ডান হাত দ্বারা ঠেলা দিলেই বকনা বা গাভীর জরায়ুতে বীর্য প্রবেশ করবে এবং কৃত্রিম প্রজনন কার্যটি সম্পন্ন হবে।

(খ) হিমায়িত বীর্য প্রয়োগ পদ্ধতি : সিমেন ক্যান থেকে চিমটার সাহায্যে একটি করে বীর্য ভর্তি নল বা স্ট্র উঠিয়ে তা দ্রুত ৩৪-৩৮° সে. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থার্মোফ্লাক্সের পানিতে রাখতে হয়। একে স্ট্র-থয়িং (Thawing) বলে। এবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই বীর্য ব্যবহার করতে হবে। বীর্য ভর্তি নলের কটন প্লাগ প্রান্ত নিচের দিকে রেখে খাড়া অবস্থায় উপরের বায়ুশুন্য অংশের সীল কাঁচি দ্বারা সমান করে কেটে নিতে হবে। এরপর এ.আই. গানের পিস্টন বের করে বীর্য ভর্তি নলে এমনভাবে ঢুকাতে হবে যাতে কটন প্লাগ প্রান্ত নিচের দিকেই থাকে। জীবাণুমুক্ত একটি এ.আই. সিথের ভিতর এ.আই. গান ঢুকিয়ে প্লাস্টিক রিং বা অন্য কোনো লকিং ডিভাইস দ্বারা শক্ত করে আটকাতে হবে। এ.আই. সিথ লাগানোর সময় বীর্য ভর্তি নলের কাটা প্রান্ত ও কটন প্লাগ প্রান্তের মধ্যে কোনো ফাঁক রাখা যাবে না। এরপর গরম হওয়া বকনা বা গাভীকে একটি খোয়াড়ে আটকাতে হবে। আটকানোর পর বকনা বা গাভীর যোনিদ্বারের চারপাশ পরিষ্কার করতে হবে। এরপর বাম হাতে গ্লোবস পরে তাতে তরল প্যারাফিন লাগিয়ে পিচ্ছিল করে নিতে হবে। এই গ্লোবস পরা বাম হাত বকনা বা গাভীর মলদ্বারে ঢুকিয়ে জরায়ু ধরতে হবে। ডান হাত দ্বারা এ.আই. গানটি বকনা বা গাভীর যোনিতে এমনভাবে ঢুকাতে হবে যেন বাম হাত দ্বারা তা বুঝা যায়। এরপর আস্তে আস্তে ডান হাত দ্বারা পিস্টনে চাপ দিয়ে বকনা বা গাভীর জরায়ুতে বীর্য প্রবেশ করানো হয়। এভাবেই হিমায়িত বীর্য দ্বারা কৃত্রিম প্রজননের কাজ সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য বীর্য প্রয়োগের সময় ব্যবহৃত সকল উপকরণ জীবাণুনাশক দ্বারা জীবানুমুক্ত করে নিতে হয়।

কৃত্রিম প্রজননে সফলতার কারণ -

১। কাঙ্খিত বা উর্বর ষাঁড় থেকে সঠিক পদ্ধতিতে বীর্য সংগ্রহ করা।
২। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বীর্যের গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
৩। সঠিক উপায়ে বীর্য সংরক্ষণ করা।
৪। সাবধানতার সাথে ও সঠিক উপায়ে বীর্য পরিবহন করা।

৫। প্রজনন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও তার চারিদিকের পরিবেশ দূষণমুক্ত হওয়া।
৬। কৃত্রিম প্রজননকারীর অভিজ্ঞ ও দক্ষ হওয়া।
৭। বকনা বা গাভীর প্রজননের আগে গরম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া।
৮। বকনা বা গাভীর গরম হওয়ার ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করানো।
৯। অনিয়মিত গরম হওয়া বকনা বা গাভীকে চিকিৎসা করে প্রজনন করানো।
১০। কৃত্রিম প্রজননের পূর্বে বা পরে বকনা বা গাভীকে বিশ্রামে রাখা।
১১। বকনা বা গাভীর যৌনাঙ্গে কোনো সংক্রামক বা যৌন রোগ না থাকা।

কৃত্রিম প্রজননে ব্যার্থতার কারণ -
১। রোগাক্রান্ত, অসুস্থ বা দূর্বল ও অনুর্বর ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করা।
২। বীর্যের গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া।
৩। সঠিক উপায়ে বীর্য সংরক্ষণ না করা।
৪। সাবধানতার সাথে ও সঠিক উপায়ে বীর্য পরিবহণ না করা।
৫। সিমেন ক্যানে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া।
৬। ত্রুটিপূর্ণভাবে সিমেন স্ট্র থয়িং করা।
৭। প্রজনন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও তার চারিদিকে পরিবেশ দূষিত হওয়া।
৮। কৃত্রিম প্রজননকারীর অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ হওয়া।
৯। বকনা বা গাভীর প্রজননের আগে গরম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া।
১০। বকনা বা গাভীর গরম হওয়ার ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে অর্থাৎ সঠিক সময়ে প্রজনন না করানো।
১১। প্রজনন অঙ্গের ভেতর ভুল স্থানে শুক্রাণু স্থাপন।
১২। অনিয়মিত গরম হওয়া বকনা বা গাভীকে চিকিৎসা না করে প্রজনন করানো।
১৩। কৃত্রিম প্রজননের পূর্বে বা পরে বকনা বা গাভীকে বিশ্রাম না দেয়া।
১৪। বকনা বা গাভীর যৌনাঙ্গে কোনো সংক্রামক বা যৌন রোগ থাকা।

বকনা বা গাভীর গরম হওয়া বা ডাকে আসার বাহ্যিক লক্ষণসমূহ -
১। অস্থিরতা বেড়ে যায় ও ঘন ঘন ডাকাডাকি করে।
২। এক স্থানে দাঁড়িয়ে না থেকে ছটফট করতে থাকে।
৩। লেজ উঁচু করে রাখে ও বার বার নাড়ে।
৪। ঘন ঘন অল্প পরিমাণ প্রস্রাব করে।
৫। খেতে চায় না বা খাওয়া কমিয়ে দেয়।
৬। যোনিদ্বার ফুলে যায় ও লাল দেখায়।
৭। যোনিদ্বার দিয়ে স্বচ্ছ জেলির মতো শ্লেষ্মা বের হয় যা লেজের গোড়া ও যোনির চারিদিকে লেগে থাকে।
৮। অন্য গরুর উপর লাফিয়ে উঠতে যায় এবং নিজের উপর অন্য গরুকে উঠতে দেয়। নিজের পিছনে অন্য গরুকে চাটতে দেয়।
৯। বকনা বা গাভীর শরীরের তাপমাত্রা আগের চেয়ে বেড়ে যায়।
১০। দুধালো গাভীর বেলায় দুধ দেওয়া কমে যায়।

কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা —
১। অনুন্নত দেশীয় জাতের প্রাণির/গরুর উন্নয়ন ঘটানো যায়।
২। কোনো ষাঁড় থেকে একবার সংগ্রহ করা বীর্য দ্বারা ১০০-৪০০ বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানো যায়।
৩। উন্নত জাতের বা কাঙ্খিত ষাঁড়ের বীর্য ব্যবহার করা যায়।
৪। উন্নত জাতের বা কাঙ্খিত ষাঁড়ের বীর্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা যায়।

৫। উন্নত জাতের ষাঁড় সঙ্গমে অক্ষম হলেও বীর্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা যায়।
৬। বকনা বা গাভীর গর্ভধারণের হার বেশি হয়।
৭। কাঙ্খিত ষাঁড়ের বীর্য দিয়ে দেশ এবং দেশের বাইরের যে কোনো স্থানে বকনা বা গাভীর প্রজনন করানো সম্ভব হয়।
৮। প্রাকৃতিক প্রজনন অপছন্দকারী বা ষাঁড়ের সংস্পর্শে শুয়ে পড়া বকনা বা গাভীকে এ পদ্ধতিতে প্রজনন করা সহজ।
৯। গবাদি পশুর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে হাইব্রিড বা সংকরজাত তৈরি করা যায়।
১০। ষাঁড়ের বীর্য ও বকনা বা গাভীর যোনি পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় ইত্যাদি।

কৃত্রিম প্রজননের অসুবিধা —
১। প্রজননকারীকে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হতে হয়।
২। সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।
৩। ত্রুটিযুক্ত বীর্য দ্বারা প্রজনন করালে সফলতা আসে না।
৪। সঠিক পদ্ধতিতে প্রজনন না হলে গর্ভধারণের হার কমে যায়।
৫। কাঙ্খিত জাতের ষাঁড়ের বীর্য না হলে আশা বিফলে যায়।
৬। সঠিক উপায়ে বীর্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ না করতে পারলে বীর্য নষ্ট হয়ে যায়।
৭। নীরব গরম হওয়া বকনা বা গাভীকে শনাক্ত করা কঠিন হয় বলে প্রজনন কার্য ব্যহত হয়।
৮। সঠিক সময়ের মধ্যে গরম বকনা বা গাভীকে প্রজনন করাতে ব্যর্থ হলে গর্ভধারণ করানো যায় না।
৯। প্রজননকারীর অদক্ষতার কারণে প্রজনন কার্য ব্যহত হয়।
১০। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীর্য সংরক্ষণ ও পরিবহণে অসুবিধা হয় ইত্যাদি।

কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব —
১। অনুন্নত গরুর জাতকে উন্নত জাতে রূপান্তরিত করা যায়।
২। উন্নত জাতে রূপান্তরিত করায় দুধ ও মাংসের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।
৩। গবাদিপশুর প্রজনন সংকট প্রতিরোধ করা যায়।
৪। বকনা বা গাভীর গর্ভধারণের হার বেশি হয়।
৫। কাঙ্খিত জাতের হাইব্রিড বা সংকর বাচ্চা উৎপাদন করা যায়।
৬। গবাদিপশুর বিভিন্ন ধরনের যৌন রোগ থেকে প্রতিকার পাওয়া যায়।
৭। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থান হয়।
৮। বছরে একটি ষাঁড় থেকে সংগৃহীত বীর্য দ্বারা ১০,০০০ টি বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানো যায়।
৯। কৃত্রিম প্রজনন সফল হওয়ায় কৃষকের ঘরে ঘরে উন্নত জাতের ষাঁড় পালনের প্রয়োজন পড়ে না।
১০। কাঙ্খিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংরক্ষণ করে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন প্রত্যক্ষ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন

সারাংশ

যে শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জীব তার বংশ রক্ষা করে তাকে প্রজনন বলা হয়। এই প্রজনন দু'ভাবে হতে পারে যথা- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রজনন। আবার কৃত্রিম উপায়ে ষাড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করার পর উন্নত উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই বীর্য দিয়ে ডাকে আসা বকনা বা গাভীকে প্রজনন করিয়ে গর্ভবর্তী করার প্রক্রিয়াটিকেই কৃত্রিম প্রজনন বলা হয়। বাংলাদেশে অনেক কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে। এসব কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে ডাকে আসা দেশীয় অনুন্নত বকনা বা গাভীকে উন্নত ষাড়ের বীর্য দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। অনুন্নত গরুর জাতকে উন্নত জাতে রূপান্তরিত করার জন্য কৃত্রিম প্রজনন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ষাড়ের বীর্যের শুক্রাণুর নড়াচড়ার গতি পর্যবেক্ষণের জন্য কোন গ্রেডে ব্যবহার করা হয়?

ক) ০-৫ খ) ০-৪

গ) ০-৩ ঘ) ০-২

২। কৃত্রিম প্রজননের পর বকনা বা গাভীকে কী অবস্থায় রাখতে হয়?

ক) কাজে খ) দৌড়ে

গ) বিশ্রামে ঘ) আঘাত দেয়া

৩। গরম হওয়া বকনা বা গাভী-

i) যা ঘন ডাকাডাকি করে।

ii) ঘন ঘন প্রসাবে করে

iii) অস্থিরতা বেড়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও —

জব্বার মিয়া কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র থেকে উন্নত ষাড়ের তরল বীর্য সংগ্রহ করলেন। এরপর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঐ বীর্য এনে পাশের বাড়ীর কৃষক লিটন মিয়াকে দিয়ে তার গরম হওয়া বকনার প্রজনন কার্য সম্পাদন করালেন। কিছুদিন পর দেখা গেল বকনাটি গর্ভধারণ করেনি।

৪। বকনার গর্ভধারণ না করার কারণ কী?

i) অনভিজ্ঞ প্রজননকারী

ii) সঠিক নিয়মে বীর্য পরিবহণ না করা

iii) বকনাটি গরম ছিল না

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। তরল বীর্য কীভাবে পরিবহণ করা উচিত ছিল?

ক) শুধু থার্মোফ্লাক্সের ভিতর খ) থার্মোফ্লাক্সের বরফের ভিতর

গ) স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঘ) কৌটার ভিতর

পাঠ-৫.৮ ব্যবহারিক ঃ ঘরের ভিতরে মাশরুম চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঘরের ভিতরে মাশরুম চাষ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ লিখতে পারবেন;
- মাশরুম চাষে কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা বলতে পারবেন।

মূলতত্ত্ব :

মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু একটি সবজি। মূলতঃ একটি ছত্রাক জাতীয় একটি উদ্ভিদ। এর ভেষজ গুণ রয়েছে। চাষ করার জন্য মাঠে কোনো জমির প্রয়োজন পড়ে না। ঘরের মধ্যেই ৭-১০ দিনে জন্মানো যায়। ঘরের মধ্যেই তাকে তাকে সাজিয়ে জন্মানো যায় বলে একটি ঘরকে কয়েকটি ঘরের সমান ব্যবহার করা যায়। মাশরুমের বীজকে স্পন বলা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১। মাশরুম বীজের প্যাকেট ২। কাঠ বা বাঁশের তৈরি তাক ৩। স্প্রেয়ার ৪। প্লাষ্টিকের গামলা বা বালতি ৫। চট ৬। চোষ কাগজ ৭। ব্লেড বা চাকু ৮। ছিদ্রযুক্ত লম্বা পলিথিন শীট ৯। খবরের কাগজ বা পাতলা সুতি কাপড় ১০। থার্মোমিটার ১১। হাইগ্রোমিটার ইত্যাদি।

কাজের ধাপ :

১। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে মাশরুম বীজের প্যাকেট সংগ্রহ করুন।

২। প্রতিটি প্যাকেটের দুই পাশের কাঁধ বরাবর অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির বা উল্টো D আকারে কেটে নিন।

৩। গামলা বা বলতিতে পানি নিয়ে কাটা প্যাকেটগুলো উপুড় করে চুবানোর পর ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নিন।

৪। প্যাকেটগুলো ঘরের মেঝে বা তাকে ২ ইঞ্চি পর পর সারি করে সাজিয়ে নিন।

৫। পাকেটগুলোর পার্শ্বের আর্দ্রতা ৭০-৮০% রাখার জন্য শীতে ও বর্ষার দিনে ২/৩ বার এবং গরমের সময় দিনে ৪/৫ বার পানি স্প্রে কর এবং প্রয়োজনে চোষ কাগজ পানিতে ভিজিয়ে প্যাকেটগুলোর পার্শ্বে স্থাপন করুন।

৬। ঘরের তাপমাত্রা ২০-৩০° সে. এর বেশি হলে প্যাকেটের একটু উপরে পাতলা সুতি কাপড় বা খবরের কাগজ বিছিয়ে দিন।

৭। ঘরের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনে প্যাকেটগুলোর উপর সামান্য উঁচু করে ছিদ্রযুক্ত লম্বা পলিথিন শীট বেঁধে দিন।

৮। মাশরুম বীজের প্যাকেট তাকে বসানোর ২-৩ দিনের মধ্যে পিনের মতো মাশরুম অঙ্কুর বের হবে। একসাথে অনেক অঙ্কুর বের হলে নিচের ছোটগুলো কেটে ফেল এবং ৮-১২ টি ফ্রুটিং বডি রেখে দিন।

৯। অঙ্কুরগুলো যাতে কোনোভাবে ভেঙ্গে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

১০। অঙ্কুর বের হবার ৫-৭ দিনের মধ্যেই মাশরুম তোলা বা সংগ্রহ করার উপযোগী হবে।

১১। মাঝে মাঝে চাষ ঘরের চট বেড়া ও মেঝে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিন।

১২। চাষ ঘরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য মাঝে মাঝে থার্মোমিটার দ্বারা তাপমাত্রা ও হাইগ্রোমিটার দ্বারা আর্দ্রতা মেপে নিন।

সতর্কতা :

১। মাশরুম অত্যন্ত স্পর্শকাতর সবজি হওয়ায় চাষ ঘর ও এর আশে পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যাবশ্যক।

২। প্রয়োজনে স্প্রেয়ারের মাধ্যমে চাষ ঘরের চট বেড়া ও মেঝে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।
৩। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনে চোষ কাগজ ভিজিয়ে প্যাকেটের পার্শ্বে রাখতে হবে অথবা সুতি কাপড় বা খবরের কাগজ দিয়ে প্যাকেট ঢেকে দিতে হবে।
৪। অঙ্কুর বের হবার সময় এমনভাবে পানি স্প্রে কর যাতে পানির ফোঁটার আঘাতে মাশরুম অঙ্কুর ভেঙ্গে না যায়।
৫। কাঁটা অঙ্কুরগুলোর স্থান এমনভাবে চেছে দিতে হবে যাতে প্যাকেটের গায়ে কোনো গর্ত তৈরি না হয়।
৬। মাশরুম ভালোভাবে সংরক্ষনের স্বার্থে তোলার ১২ ঘন্টা আগ পর্যন্ত এর গায়ে পানি স্প্রে করা যাবে না।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বর্তমানে বেশ কিছু অণুজীব সার আবিষ্কার করেছেন। এসব সারের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। তাছাড়া এসব সারের তৈরী খরচ কম এবং বিশেষ কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়ে না। এসব অণুজীব মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসব অণুজীব সারের মধ্যে এ্যাজোলা অন্যতম। এ সার বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন মাটিতে যুক্ত করে বলে আলাদাভাবে সে জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।
ক) এ্যাজোলা কি ?
খ) কয়েকটি অণুজীব সারের নাম লিখুন।
গ) এ্যাজোলা জীবাণু সার ইউরিয়ার বিকল্প-ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) স্থানীয়ভাবে এ্যাজোলা সার তৈরীর পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

২। বিটল গ্রামের মাটি পাট চাষের জন্য খুবই উপযোগী। কিন্তু কোনো জলাধার না থাকায় কৃষকরা পাট চাষ করতে পারে না। আকবর নামে একজন কৃষক উপজেলা কৃষি অফিসে দিয়ে পাটের রিবন রেটিং সম্বন্ধে জেনে এসে ঐ গ্রামে পাট চাষ শুরু করেন এবং লাভবান হোন। তাকে দেখে গ্রামের সকল কৃষক উদ্বুদ্ধ হয়ে পাট চাষ শুরু করেন।
ক) পাটের রিবন রেটিং কী?
খ) পাটের রিবন রেটিং পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
গ) পাটের ছাল পচানো পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) পাটের রিবন রেটিং একটি লাভজনক পদ্ধতি বিষয়টি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করুন।

৩। জহিরের বাবা নেই। ছোট ভাই বোন ও মাকে নিয়ে তার সংসার। বাবার মৃত্যুর পর অভাবের কারণে তার পড়ালেখা চালানো সম্ভব হয়নি। অভাব তাকে সর্বদাই তাড়িয়ে বেড়ায়। হঠাৎ একদিন এক কীটতত্ত্ববিদের সাথে আলোচনা করে রেশম চাষ শুরু করেন এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। এতে তার গ্রামের অন্যান্য বেকার ছেলেরাও অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে রেশম চাষ শুরু করেন।
ক) সেরিকালচার কী?
খ) কীটতত্ত্ববিদের সাথে আলোচনা করে জহির কী শিক্ষা পেয়েছিলেন?
গ) জহিরের স্বাবলম্বী হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করুন।
ঘ) গ্রামের অন্যান্য বেকার ছেলেদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ মূল্যায়ন করুন

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২ : ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩ : ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪ : ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬ : ১। ক ২। গ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ক ৫। খ